Vol. 38 | No. 3 | 1995

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বাংলা অভিধান-চর্চায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণ

Volume	38
Issue	3
Year	1995
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	নরেন বিশ্বাস
Published online	June 1, 1995
DOI	10.62328/sp.v38i3.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v38i3.3
Pages	67-101
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

সাহিত্য পত্রিকা
বর্ষ ৩৮ : সংখ্যা ৩

Check for updates

বাংলা অভিধান-চর্চায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণ

নরেন বিশ্বাস

বাংলা অভিধানকারদের উপর সংস্কৃত ভাষার ঐতিহ্যের যথেষ্ট প্রভাব সত্ত্বেও আধুনিক বাংলা ভাষার অভিধান সংকলনের রীতি ও আদর্শ আদৌ সংস্কৃত প্রভাবিত নয়। আধুনিককালের বাংলা অভিধান পরিকল্পনায় ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের ইংরেজি অভিধানের প্রভাব সুস্পষ্ট। তবে ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ইদানিংকালে অভিধান-সংকলনের ধারণাও অনেকাংশে পরিবর্তনমুখী।

বাংলা ভাষায় এযাবতকাল যত অভিধান সঙ্কলিত হয়েছে তা মূলত ব্যবহারিক অভিধান। আদর্শ তাত্ত্বিক অভিধান এখনও আমাদের অনায়ত্ত রয়ে গেছে। বর্তমান নিবন্ধের অনুসন্ধানের বিষয় অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা অভিধান চর্চার ধারা। এই ধারায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদানের মূল্যায়ন এর প্রধান উদ্দেশ্য।

অধ্যাপক, বাংলা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রস্তাবনা

অভিধান শব্দের আভিধানিক অর্থ 'শব্দার্থ প্রতিপাদক গ্রন্থ' বা শব্দকোষ। প্রাচীন পণ্ডিতসমাজে শব্দের ত্রিবিধ 'শক্তি' স্বীকৃত : অভিধা, লক্ষণা ও ব্যঞ্জনা। শব্দের প্রথম ও প্রধান অর্থকে বলা হয় অভিধা। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যায় : "শব্দের যে শক্তিতে তাহার মুখ্যার্থ বা বাচ্যার্থ প্রতীত হয়, অর্থাৎ শব্দের উচ্চারণ মাত্রেই তাহার কোষ ব্যাকরণাদি-প্রসিদ্ধ অনায়াসলভ্য সহজ মুখ্য অর্থের বোধ হয়, তাহা 'অভিধা'–শক্তি। এইরূপ মুখ্যার্থের উপলব্ধি হেতু অভিধাশক্তি (the literal sense of word) প্রথম।" [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৮ : ১৫১] শব্দের লক্ষণা-শক্তি হচ্ছে প্রয়োজন হেতু কল্পনায় কোনো শব্দের উপর বিশেষ অর্থ আরোপ করা, অর্থাৎ শব্দের 'অভিধা' বা আভিধানিক অর্থের অতিরিক্ত তাৎপর্য বিশেষ। আর 'ব্যঞ্জনা' হচ্ছে শব্দের এমন এক 'শক্তি' যা দিয়ে অভিধা-লক্ষণার্থ ও তাৎপর্যার্থের অতিরিক্ত ব্যঙ্গার্থ বা গূঢ়ার্থের বোধ জন্মে। অভিধানে 'অভিধা'-ই প্রধান বা উপজীব্য এবং এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তা-ই প্রমাণ করে : (অভি (সম্যক্)–ধা (ধারণ, পোষণ করা)+ অনট্ বা অন] অর্থাৎ যে গ্রন্থে শব্দের সম্যক বা পরিপূর্ণ অর্থ ধরা পড়ে বা যা দিয়ে অর্থের উত্তম বা পূর্ণ প্রকাশ ঘটে।

সংস্কৃত-শব্দতাত্ত্বিকেরা অভিধানে তিনটি 'কাণ্ড' বা বিষয়কে মুখ্য বিবেচনা করতেন : (ক) পর্যায়, (খ) নানার্থ এবং (গ) লিঙ্গ। এ-পারিভাষিক শব্দ তিনটির সহজ ব্যাখ্যা হচ্ছে : একটি জিনিসের বহুবিধ নামের একত্র সন্নিবেশকে বলা হয় 'পর্যায়'; একই শব্দের নানা ধরনের অর্থকে 'নানার্থ' আর সংস্কৃতে যেহেতু প্রতিটি শব্দেরই লিঙ্গ আছে, তাই অভিধানের যে অংশে বা কাণ্ডে লিঙ্গ নির্ধারণ করা হয় তাকে বলা হয় 'লিঙ্গ'। পর্যায় এবং নানার্থ-এর মধ্যে মূল পার্থক্য হচ্ছে, প্রথমটি 'সমনাম' বা synonym সংকলন, আর দ্বিতীয়টি সমার্থশব্দ সংগ্রহ। যেমন : *পৃথিবী*— ধরিত্রী, ধরা, বসুধা, ধরণী, বসুমতী, বসুন্ধরা, মেদিনী, ক্ষিতি, অবনী, মহী, জগৎ ইত্যাদি নামের সন্নিবেশকে বলা হয় 'পর্যায়'। আর *অংশ*— ভাগ, বণ্টন, অঞ্চল, ভগ্নাংশ, শরীর বা যন্ত্রাদির প্রত্যঙ্গ, খণ্ড, টুকরা ইত্যাদি অর্থের সংগ্রহকে 'নানার্থ' বিবেচনা করা হতো।

মনীষী যাস্ক রচিত বেদাঙ্গগ্রন্থ 'নিরুক্ত'কে শব্দার্থবোধক বৈদিক অভিধান বলা হলেও খ্রিস্টীয় ৪র্থ শতাব্দ থেকে ৬ষ্ঠ শতাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে রচিত অমরসিংহ-কৃত *অমরকোষ*-ই সংস্কৃত ভাষার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় কোষগ্রন্থ। এ-শব্দকোষের প্রকৃত নাম ছিল 'নাম লিঙ্গানুশাসন', পরে কবি অমরসিংহের নামানুসারে *অমরকোষ* নামে পরিচিতি লাভ করে। এ কোষগ্রন্থের শব্দসমূহ স্বর্গবর্গ, পাতালবর্গ, ভূমিবর্গ, বনৌষধিবর্গ, মনুষ্যবর্গ ইত্যাদি বর্গানুসারে বিভক্ত। 'পর্যায়',

'নানার্থ' ও 'লিঙ্গ'—তিনটি কাণ্ডই আছে বলে অমরকোষকে 'ত্রিকাণ্ড' নামেও অভিহিত করা হয়। ছন্দোবদ্ধ এ-শব্দকোষটি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার্থীর কাছে এখনও অপরিহার্য গ্রন্থ। *অমরকোষের* বিপুল জনপ্রিয়তার প্রমাণ এর অর্ধশতাধিক টীকাগ্রন্থ। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্যের *বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়*-এর ভূমিকায় উল্লিখিত হয়েছে :

"এত টীকা খুব কম অভিধানেরই আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১১৫৯ খ্রীষ্টাব্দে) সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় নামক জনৈক বাঙালী শব্দতাত্ত্বিক *টীকাসর্বস্ব* নামে এক টীকা প্রণয়ন করেন। ... বাঙলা অভিধানের ইতিহাসে এই টীকাখানির এক বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। কারণ এই *টীকাসর্বস্বে* সংস্কৃত শব্দের প্রতিশব্দস্বরূপ প্রায় ৩০০ দেশজ শব্দের উল্লেখ আছে। এইসব দেশজ শব্দের মধ্যে বহু শব্দই প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে প্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি শব্দ উদ্ধৃত হইল—

টীকাসর্বস্বে প্রদত্ত শব্দ	শব্দের আধুনিক রূপ
১। ফড়িঙ্গ	ফড়িঙ্গ (পতঙ্গ অর্থে)
২। ডাশ	ডাঁশ
৩। ডাঢ়কাক	দাঁড়কাক
৪। জালি বা জালী (কুম্মাণ্ডাদি জালিকারা—মচিরোদ্ভূতারাস্) জালি, জালী।	
৫। কড়ক্ক (সমুদ্র বেলাভবে কড়কচেতিখ্যাতে লবণে—কড়কচ। অঙ্গীবদ্বয়ম)।	
৬। বেঙ্গ	বেং, বেঙ, (ভেক অর্থে)
৭। চাল	চাল
৮। টোপর	টোপর
৯। মহুআ	মহুয়া
১০। সিঙ্কল, সিকল	শিকল ইত্যাদি

অতএব বাঙলা শব্দাভিধানের প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে এই 'টীকাসর্বস্বের' উল্লেখ করতে পারি [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : —]।

এ-ধরনের বিচ্ছিন্ন কতিপয় দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে আমরা কোনোভাবেই প্রমাণ করতে পারবো না আধুনিক বাংলা অভিধানের ধ্যান-ধারণা সংস্কৃত শব্দকোষ-চর্চা থেকে আগত। আসলে 'অভিধান' শব্দটি 'তৎসম' বা সংস্কৃত হলেও আধুনিক অভিধান সঙ্কলন রীতি ও আদর্শ আদৌ সংস্কৃত-প্রভাবিত নয়। এর বড় প্রমাণ, শব্দের আদ্যবর্ণের ক্রম-অনুসারে শব্দ সাজানো রীতি সংস্কৃত শব্দার্থ-কোষে অনুসৃত হতো না। বিষয়-অনুসারে বিন্যস্ত কোষগ্রন্থসমূহ প্রধানত পণ্ডিতদের প্রয়োজনে সঙ্কলিত হতো। এবং সাধারণ পাঠকের পক্ষে প্রার্থিত শব্দটি খুঁজে বের করা ছিল দুরূহ। ফলে ছন্দোবদ্ধ প্রাচীন সংস্কৃত কোষগ্রন্থাদি থেকে শব্দ অনুসন্ধান করতে হতো বেশির ভাগ ক্ষেত্রে স্মৃতি-শক্তির সহায়তায়। ত্রিকাণ্ডে বিন্যস্ত, বর্গানুসারে সজ্জিত, ছন্দোবদ্ধ 'অমরকোষ' এ-জাতীয় গ্রন্থের উজ্জ্বল উদাহরণ। ঊনবিংশ শতাব্দে (১৮-২২-১৮৫৮) সঙ্কলিত রাজা রাধাকান্ত দেবের 'শব্দকল্পদ্রুম' সংস্কৃত অভিধান অবশ্য গদ্য ভাষায় বর্ণিত।[১] সুতরাং আধুনিককালে 'অভিধান' শব্দটি আমরা ইংরেজি Dictionary বা গ্রিক Lexicon শব্দের পরিভাষা রূপেই গ্রহণ করেছি। অভিধান সঙ্কলন পদ্ধতি, আদর্শ-উদ্দেশ্যও বহুলাংশে পাশ্চাত্য প্রভাবিত। বর্ণানুক্রমে শব্দ সাজানোর পদ্ধতি; শব্দের বর্ণনা অর্থাৎ উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি, পদ-পরিচয়, শব্দার্থ নির্দেশ, ব্যাখ্যা, প্রয়োগ দৃষ্টান্ত, সুনির্দিষ্ট নীতিমালা অনুসারে বানান নির্ধারণ, উচ্চারণ নির্দেশ ইত্যাদি অভিধানের আবশ্যিক বিষয় রূপে বিবেচিত হয়েছে ইংরেজি অভিধানের আদর্শ অনুসারে। 'পর্তুগীজ-বাংলাকোষ' ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হলেও আধুনিককালের বাংলা অভিধান পরিকল্পনায় সর্বাধিক প্রভাব পড়েছে ডক্টর স্যামুয়েল জনসন-এর *Dictionary of the English Language* (১৭৫৫), ওয়েবস্টার-এর *American Dictionary of the English Language* (১৮২৮) এবং *The Oxfrod English Dictionary* (১৮৮৪-১৯২৮)- এসব পৃথিবী বিখ্যাত অভিধানের।

স্যামুয়েল জনসন-এর অভিধান বস্তুত অভিধান সঙ্কলনের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করে। কেবল পাশ্চাত্যে নয়, প্রাচ্য ভাষার অভিধানসমূহেও তার প্রভাব লক্ষযোগ্য হয়ে ওঠে। সুতরাং আধুনিককালে সঙ্কলিত বাংলা অভিধানে যখন আমরা বর্ণানুক্রমিক সাজানো শব্দের অর্থ নির্ধারণ ও ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করতে দেখি, প্রমিত বানান উচ্চারণের বর্ণনা পাই, শব্দের সংজ্ঞার্থ প্রদান ও মহৎ সাহিত্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে তার প্রয়োগ পদ্ধতি জ্ঞাপন করতে দেখি, তখন আধুনিক ইংরেজি অভিধানের পথিকৃত ডক্টর জনসনকেই সর্বাধিক মনে পড়ে।

তবে ভাষাবিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে ইদানিংকালে অভিধান সঙ্কলনের ধারণাও অনেকাংশে পরিবর্তনমুখী। আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা প্রধাণত দু' ধরনের অভিধানের কথা বলেন— (১) ব্যবহারিক অভিধান (Partical Dictionary) এবং

(২) ভাষাবিজ্ঞানসম্মত বা আদর্শ তাত্ত্বিক অভিধান (Theoretical Dictionary)। আমরা প্রবন্ধের প্রস্তাবনাকে প্রলম্বিত না করেই বলতে পারি বাংলা ভাষায় এ-যাবৎকাল যত অভিধান সঙ্কলিত হয়েছে তা ব্যবহারিক পর্যায়েরই অভিধান, আদর্শ তাত্ত্বিক অভিধান এখনও প্রকৃত বাংলা ব্যাকরণের মতোই আমাদের অনায়ত্ত রয়ে গেছে। তবে যেকোনো নতুন পদ্ধতি অবলম্বনের প্রাক-শর্ত হচ্ছে পুরোনোকে ভালো করে জানা বা পর্যালোচনা করে দেখা। আমরা সে প্রত্যাশা নিয়েই প্রথমে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করবো বাংলা অভিধান চর্চার ধারা এবং সেই ধারায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো অবিস্মরণীয় আভিধানিকের ঐতিহাসিক অবদান।

॥ দুই ॥ বাংলা অভিধান-চর্চা

এ-উপমহাদেশে বিপুল পরিমাণ সংস্কৃত কোষগ্রন্থ সঙ্কলিত বা রচিত হলেও এবং তার মধ্যে কোনো কোনো বইয়ের টীকা-ভাষ্যে বাংলা প্রতিশব্দের নমুনা পাওয়া গেলেও বাংলা অভিধান জাতীয় রচনার সন্ধান মেলে না অষ্টাদশ শতাব্দের আগে। কারণ, দর্শনপুষ্ট ধর্মানুভূতি-প্রধান প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভাষিক বা আর্থিক জিজ্ঞাসা যতটা প্রবল ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরমার্থিক প্রশ্ন। ফলে এ যুগের বাঙালী পাঠক অনেকেই কাব্য-সাহিত্যে ব্যবহৃত শব্দের বৈয়াকরণিক বা আভিধানিক ব্যাখ্যাকে যতটা গুরুত্ব দিয়েছেন তার থেকে জরুরি বিবেচনা করেছেন ধার্মিক তত্ত্বসমূহকে। সুতরাং বাংলা ব্যাকরণের মতোই বাংলা অভিধান সঙ্কলনও সূচিত হয় বিভাষী-বিদেশীদের হাতে।

ধর্মপ্রচার, বাণিজ্য-বিস্তার এবং রাজ্যশাসনের জন্যেই মূলত তাদের প্রয়োজন হয়েছিল এদেশের সাধারণ মানুষের ভাষা জানা এবং তাদের ভাষার সঙ্গে বাঙালীকে পরিচয় করানো। আমরা কালানুক্রমিকভাবে বাংলা অভিধান-চর্চার ইতিহাসকে তিনটি পর্বে বিভাজন করেছি এ অধ্যায়ে—

(ক) প্রথম পর্ব (দ্বিভাষিক অভিধান, অষ্টাদশ শতাব্দ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্য ভাগ অর্থাৎ ১৭৪৩ থেকে ১৮৫৪);

(খ) মধ্য পর্ব-বাংলা অভিধান (১৮১৭ থেকে ১৯০০); এবং

(গ) আধুনিক পর্ব (১৯০১ থেকে ১৯৯০)।

এ তিন পর্বে বিভাজিত অসংখ্য অভিধানের বিবরণ প্রদান আমাদের উদ্দেশ্য নয়, আমরা এর থেকে বৈশেষিক লক্ষণঋদ্ধ কতিপয় অভিধানের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেবো এবং আধুনিক পর্বে উল্লিখিত বিখ্যাত জনপ্রিয় অভিধানসমূহের মধ্য থেকে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* ও *বঙ্গীয়*

শব্দকোষ-এর বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করবো।

প্রথম পর্ব : দ্বি-ভাষিক অভিধান

আমরা এ নিবন্ধের প্রস্তাবনায় 'অমরকোষ'-এর টীকাগ্রন্থ বাঙালী শব্দতাত্ত্বিক সর্বানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'টীকাসর্বস্ব'-এ (১১৫৯) প্রাপ্ত কতিপয় দেশজ শব্দের উল্লেখ করেছি এবং দ্বাদশ শতাব্দের গুজরাটবাসী জৈনপণ্ডিত হেমচন্দ্র সূরি সঙ্কলিত 'রত্নাবলী' বা 'দেশী নামমালা'-তেও শতাধিক বাংলা শব্দ [কোইলা—কঠ্ঠ অংগরা (কণ্ঠাঙ্গারাঃ); কোলাহল—খগরুএ (খগরুতম্); খড় (তৃণম); গোবর; গোঅলা (দুগ্ধ বিক্রয়কর্ত্রী); চাউল; ঝাড়ু ইত্যাদি] পাওয়া যায় বলে পণ্ডিতদের বিশ্বাস। এ জাতীয় বেশ কিছু গ্রন্থে বাংলা শব্দের নমুনা পাওয়া সত্ত্বেও আমরা বাংলা অভিধান-চর্চার সূচনা সাল হিসেবে চিহ্নিত করেছি ১৭৪৩-কে। কারণ এ বছরেই বাংলা ভাষার প্রথম অভিধান 'VOCABULARIO/ EM IDIOMA/ BENGALLA,/E/ PORTUGUEZ' বা 'বাংলা ও পোর্তুগীজ ভাষার শব্দকোষ' প্রকাশিত হয়। এ-গ্রন্থের সঙ্কলক পাদ্রি ম্যানোএল-দা-আস্-সুমু সাঁও (Manoel-da-Assumpcam)। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি এ শব্দকোষ সঙ্কলন করেছিলেন, কারণ তাঁর বিশ্বাস ছিল, "যে প্রচারক তাঁহার ধর্মগোষ্ঠীর ভাষা জানে না সে প্রচারক হইবার উপযুক্ত নহে।"[২] তিনি শব্দকোষটি প্রস্তুত করেছিলেন পোর্তুগীজ খ্রিস্টান মিশনারিদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ঢাকার নাগরীতে বসে। ১৭৪৩ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগালের রাজধানী লিসবন নগরীতে গ্রন্থটি রোমান হরফে মুদ্রিত হয়। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য এ গ্রন্থের বিবরণ তুলে ধরেছেন :

> গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ১০+৫৯২। প্রথম ১০ পৃষ্ঠা ভূমিকা প্রভৃতি, তৎপর ১-৪০ পৃষ্ঠা ব্যাকরণ, পরবর্তী ৪১-৫৯২ পৃষ্ঠা শব্দসংগ্রহ। এই শব্দসংগ্রহ প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, পৃষ্ঠা ৪১-৩০৬ বাঙলা-পোর্তুগীজ ও ৩০৭-৫৭০ পোর্তুগীজ-বাঙলা শব্দ। অবশিষ্ট ৫৭১-৫৯২ পৃষ্ঠায় নানারূপ শব্দ শ্রেণী হিসাবে সংগৃহীত হইয়াছে। যেমন তিথির নাম, সংখ্যা-বাচক শব্দ, সপ্তগ্রহের নাম, ইত্যাদি। সর্বশেষে অনেকগুলি সমোচ্চার্য বাঙলা শব্দ দেওয়া আছে।
>
> এই স্থলে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, শব্দসংগ্রহ অংশের দ্বিতীয় ভাগে অর্থাৎ 'পোর্তুগীজ-বাঙলা' শব্দ সংগ্রহ ভাগে কোনো নতুন বাঙলা শব্দ নাই। এই ভাগে প্রথম ভাগেরই শব্দগুলিকে পোর্তুগীজ শব্দের প্রতিশব্দ রূপে দেওয়া হইয়াছে মাত্র। এই শব্দসংগ্রহের উভয় বিভাগই রোমান অক্ষরে রোমান বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত। প্রতি পৃষ্ঠায় এক 'কলাম' করিয়া— প্রথম বিভাগে বাঙলা শব্দ ও তাহার পোর্তুগীজ প্রতিশব্দ এবং দ্বিতীয় বিভাগে 'পোর্তুগীজ' শব্দ ও তাহার বাঙলা প্রতিশব্দ মুদ্রিত হইয়াছে। [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ৪-৫]

এ শব্দকোষে বাংলা শব্দগুলো যেহেতু পোর্তুগীজ-উচ্চারণ অনুসারে রোমান হরফে বর্ণিত হয়েছে তাই অনেক ক্ষেত্রে শব্দের প্রকৃতরূপ সনাক্ত করা কষ্টসাধ্য হয়ে ওঠে। তবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত (১৯৩১) ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও প্রিয়রঞ্জন সেন সম্পাদিত বাংলা সংস্করণ-এ প্রচুর পরিমাণে বাংলা আঞ্চলিক বা দেশী শব্দ (বিশেষ করে ঢাকার ভাওয়াল অঞ্চলের) ও বিদেশী শব্দের সন্ধান মেলে। যেমন :

১। Acol—আকল। Capacidade (বাংলা ও পোর্তুগীজ শব্দসংগ্রহ বিভাগ, পৃষ্ঠা-৪১)

২। Badam—বাদাম, (নৌকার পাল)। Vella de nao, (পৃ. ৪৭)

৩। Catthamo—কাঠামো। Obra de muito relevo, (পৃ. ৫৮)

৪। Ec roti, Uc ttuc— এক রতি, এক টুক। Ham nada (পৃ. ৭৪)

৫। Ga, gotor— গা, গতর। Corpo, (পৃ. ৭৫)

৬। Hanxuli— হাঁসুলি (গলভূষণ)। Arrecada do pescoco, (পৃ. ৮০)

৭। Macunda— মাকুন্দা, (শ্মশ্রুহীন)। Desbarbado (পৃ. ৮৫)

এছাড়াও চাটাই, দরমা, বাজ্ঞী, বরই, ডুমা, কাউয়া (কাক) ইত্যাদি আঞ্চলিক শব্দের সঙ্গে, সেদিনের জনজীবনে নিত্যব্যবহৃত বেশকিছু আরবি-ফার্সি শব্দেরও (আখের, আওয়াজ, আমল, কাছারী, ইজারি, বাবুর্চি, বেগুনা, কুলুপ ইত্যাদি) সন্ধান মেলে।

ম্যানোএল-দা-আসস্সুম্পসাঁও-এর শব্দকোষের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের প্রাধান্য নেই, তার পরিবর্তে পূর্ববঙ্গের ভাওয়াল অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন কথাবার্তায় ব্যবহৃত প্রচলিত বাংলা শব্দাবলি সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে। গ্রন্থকারও শব্দকোষের মুখবন্ধে বলেছিলেন : "ইহাতে তুমি আর কিছু না হউক, অন্ততঃ দেশীয়দের ব্যবহৃত শব্দগুলির অধিকাংশ পাইবে" [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ৫]। ধর্মপ্রচারের জন্য আগত পাদ্রি ম্যানোএল জীবন্ত বাংলা ভাষার প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের ঐতিহাসিক স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর রচিত ব্যাকরণ ও শব্দকোষ গ্রন্থে। ফলে বাংলা ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চার ধারায় তাঁর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মর্তব্য।

আনুমানিক ১৭৭৪-৭৫ সালে হ্যালহেডের অনুরোধে তাঁর অজ্ঞাতনামা বাঙালি ভাষা শিক্ষক বা মুন্‌শি সঙ্কলন করেন ১০০ পৃষ্ঠার একটি বাংলা-ফার্সি শব্দকোষ। বাঙালি মুন্‌শি প্রণীত এ প্রথম অভিধানে দু'হাজার বাংলা শব্দ সঙ্কলিত হয়েছে। সঙ্কলিত বেশির ভাগ শব্দই বাংলাদেশের (পূর্ববঙ্গের) জনজীবনে নিত্যব্যবহৃত

আঞ্চলিক ও অতি পরিচিত আরবি-ফার্সি শব্দ; তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ নেই বললেই চলে। যেমন, দেশজ শব্দ : কেলা (কলা); খালই; গাড়া (গর্ত); জাড় (শীত); ঠোসা (ফোস্কা); ডিবা (কৌটা); কৈতার (কবুতর); খাট্টা (টক); গোদারা (খেয়া); মাঠা (ঘোল); দুব্‌লা (দুর্বা) ইত্যাদি। এসব শব্দের সঙ্গে স্থান লাভ করেছে গ্রাম্য সমাজ-সংস্কৃতিতে, জীবনাচারে প্রতিদিন উচ্চারিত বেশকিছু আরবি-ফার্সি শব্দও : গাহাক; রেজগি; কিসমত; কিস্তি; খামাখা; জাহির; তালুক; দাগা; নেহাল; হজ; হাজী; পীর; মোল্লা; নামাজ; দরগা; দোয়া; জুম্মা; গুনা; কাফন; কাবিন; সেলাম ইত্যাদি। চন্দননগরের ফরাসি সরকারের দোভাষী ওগুস্ত্যা ওসাঁ-র হাতে লেখা আটখানি পুস্তকের (১৭৮১-১৭৮৫ সালের মধ্যে প্রস্তুত) পাণ্ডুলিপি পাওয়া গেছে প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার 'বিব্লিওতেক্ নাসিওনালে' (Bibliotheque Nationale)। ১৩৩০ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা *ভারতী* পত্রিকায় ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ওসাঁর অমুদ্রিত এই পাণ্ডুলিপি থেকে প্রথম চারখানির বিবরণের ভাবানুবাদ প্রকাশ করেন গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনীসহ। পোর্তুগীজ-বাংলা শব্দকোষে ম্যানোএল যেমন তাঁর ভাষার রীতি অনুসারে রোমান হরফে বাংলা শব্দের বানান লিখেছিলেন, ওসাঁও তেমনি ফরাসি-বাংলা অভিধানে তাঁর নিজের ভাষার উচ্চারণ অনুসারে রোমান লিপিতে বাংলা শব্দের বর্ণনা করেছেন। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ওসাঁ পাদ্রি ম্যানোএল-দা-আস্‌সুম্প সাঁও-এর শব্দকোষের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। ফরাসি-বাংলা অভিধানে (১৭৮৩) ফরাসি শব্দের সংখ্যা প্রায় ১১,০০০ এবং তার বাংলা প্রতিশব্দের সংখ্যা আনুমানিক ৩০,০০০; পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৮৪ [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ২৩৫]। দ্বিভাষিক এ-অভিধানটিতেও খাঁটি বাংলা শব্দের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়।

১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার ক্রনিকল (Chronicle) প্রেসে মুদ্রিত হয় 'ইঙ্গারাজি ও বাঙ্গালি বোকেবিলোরি' বা 'An Extensive Vocabulary, Bengalies and English– নামে ৪৪৫ পৃষ্ঠার একটি অভিধান। এ গ্রন্থের আখ্যাপাত্রে বা ভূমিকায় সঙ্কলকের নাম উল্লিখিত হয়নি, তবে এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— বর্ণানুক্রমিক শব্দ সজ্জিত এ শব্দকোষটির বাংলা শব্দসমূহ প্রথম বাংলা হরফে মুদ্রিত। এর প্রধান উদ্দেশ্য— "very useful to teach the Natives English, and to assist beginners in learning the Bengal Lenguage." [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ৯]। ইংরেজি ও বাংলা ভাষা শিক্ষার সহায়ক এ গ্রন্থটির মুদ্রক ও প্রকাশক ছিলেন এ. আপজন (Upjohn)। ১০ বছরের শ্রমে তৈরি এ-অভিধানের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে সঙ্কলিত শব্দের মধ্যে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দের সংখ্যা খুবই কম এবং দেশজ ও প্রচলিত আরবি-ফার্সি শব্দ সে-তুলনায় অনেক বেশি। কতিপয় উদাহরণ : কিরা– an oath; খোরারাটি– a cup of stone; গলি– a lane; ঘীরিতে– to cover;

চিকিৎসক–a physician: ছেচেড়া–a bad paymaster; ঝি– daughter: তারাবারা কাজ করিতে– to huddle ইত্যাদি।

১৭৯৯ সালে এইচ. পি. ফর্স্টার (H. P. Forster) তাঁর বৃহৎ অভিধান পরিকল্পনার প্রথম খণ্ড (ইংরাজি-বাংলা) প্রকাশ করেন। ১৮০২ সালে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় খণ্ড (বাংলা-ইংরাজি)। এ শব্দকোষের আখ্যাপত্র : "A Vocabulary, in two parts English and Bangalee and vice versa—by H. P. Forster." দু' কলামে মুদ্রিত অভিধানের শবব্দসমূহ রোমান বর্ণানুক্রমে সজ্জিত। প্রথম খণ্ডের ভূমিকাংশে বর্ণিত হয়েছে, পদপরিবর্তনের বিধিমালা এবং পরে বিবৃত হয়েছে বাংলা বর্ণমালা ও তার উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি বিষয়। ৪২১ পৃষ্ঠার এ অভিধান (১ম খণ্ড) শেষে ফর্স্টার সংস্কৃত সাঙ্কেতিক শ্লোকের মাধ্যমে ব্যক্ত করেছেন গ্রন্থরচনার কাল :

শাকে ভূমিভুজাদ্র্যেক বর্ষে শব্দার্থ সংশহঃ।
শ্রীমৎ ফারষ্টরেনৈষ পরোপকৃতয়ে কৃতঃ॥

অর্থাৎ ভূমি=১, ভুজ=২, অদ্রি=৭, এক=১; অঙ্কানাং বামতো গতিঃ সূত্রানুসারে ১৭২১ শক অর্থাৎ ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ" [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ১২]। সংখ্যার বামগতি অনুসারে আভিধানিক রচনাকাল জ্ঞাপন করে ঘোষণা করলেন তিনি অন্যের হিতার্থে একাজ করেছেন। ভাবিক-কল্যাণ সাধনে ব্রতী ফর্স্টার এ অভিধানে প্রতিটি ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ নির্দেশে ব্যবহার করেছেন একাধিক বাংলা শব্দ। যার মধ্যে যেমন আছে তৎসম, তদ্ভব, দেশজ, আঞ্চলিক শব্দ তেমনি সন্ধান মেলে সামান্য কিছু আরবি-ফার্সি শব্দেরও। গ্রন্থশেষে পাওয়া যায় ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী সংযোজন ও ভ্রমসংশোধন তালিকা। ফর্স্টার মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন বাংলা ঋদ্ধভাষা, এ ভাষাতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম-দর্শনের বিচিত্র বিষয় নিয়ে যেমন লেখা সম্ভব তেমনি মানব-মনের যেকোন ভাব প্রকাশের অসাধারণ শক্তি আছে ভাষাটির ভেতরে। প্রায় হাজার পৃষ্ঠার দু'খণ্ড (৪২১+৪৪৩) অভিধানে চল্লিশ হাজারের মতো (১৮,০০০+২০,০০০) শব্দের বিবরণ দিয়েও তিনি তৃপ্ত ছিলেন না; ভবিষ্যতে পূর্ণাঙ্গ অভিধান সঙ্কলনের পরিকল্পনা ছিল তাঁর। এবং তিনি "বাঙলা ভাষাকে বাঙলাদেশের একমাত্র সরকারী ভাষার (official language) গৌরব দান করিতে চাহিয়াছিলেন" [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ১৩]। এবারে তাঁর অভিধান থেকে সামান্য দু'চারটে নমুনা উদ্ধার করা হলো :

(ক) Abrupt–/পাহাড়ী, আড়রী, আড়রা, অপ্রণালী, এলুয়ামেলুয়া, অকস্মাৎ।

(খ) Bosom– বুক, বক্ষ, উরঃ, কোল, ছাতী, হৃদয়। এককালে।

(গ) Chord– তার, গুণ, তন্ত্র, তাঁইত।

(ঘ) Dam- বাঁধ, ভেড়ী, জাঙ্গাল, আলি, কাঁকিণী, খেঁকী, ধেনু, গাই।
(ঙ) Earthquake- ভূকম্প, ভূচল।
(চ) Fray- হুলস্থুল, উন্দধুন্দ, ফসাদ, কাজয়া, ঝকড়া।
(ছ) Gargle- খুনকুলা-ক, কল্লোলন, কুলকুচা-ক।
(জ) Joke- ফষ্টী, গদ্য, পরিহাস, তামাসা, কৌতুক ইত্যাদি।

ইংরেজি-বাংলা (১ম খণ্ড) আভিধানের পর বাংলা-ইংরেজি (২য় খণ্ড) থেকে—

(ক) আনাড়ি— Anaree, awkward, clumsy, ignorant, in expert, novice, unready, cobbbler, patcher.
(খ) কড়ী- Koree, a shell, (so called) cash, money, wealth, beam.
(গ) চাবী— Chabee, a key.
(ঘ) চুপড়ী— Choopree, basket.
(ঙ) জানালা— Janala, window.
(চ) দর— Dor, change, price, cost, expence, rate, valuation, value, to value.
(ছ) সিন্দুক— Shindook, box, chest, coffer, trunk— ইত্যাদি।

এ যাবৎকাল সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতদের সঙ্কলিত শব্দকোষসমূহে বাংলা চলিত ভাষার শব্দাবলি সচেতনভাবে উপেক্ষিত হতো, ফর্‌স্টার তাঁর অভিধানে উদারভাবে জায়গা করে দিয়েছেন জনজীবনে নিত্য ব্যবহৃত এ শব্দসমূহকে।

১৮১০ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহকারী গ্রন্থাধ্যক্ষ মোহনপ্রসাদ ঠাকুর প্রথম বাঙালী যিনি উইলিয়াম কেরির প্রস্তাবে এবং অনুপ্রেরণায় সঙ্কলন করেন একখানি ইংরেজি-বাংলা অভিধান। প্রধানত ছাত্রদের জন্যে প্রণীত অভিধানখানির একাধিক সংস্করণ হলেও গ্রন্থটি বর্ণানুক্রমিক সজ্জিত নয়, সংস্কৃত 'অমরকোষ'-এর মতো বর্গ বা বিষয় অনুসারে বিন্যস্ত।

ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা, সংস্কৃত ও মারাঠা ভাষার অধ্যাপক উইলিয়াম কেরি বাংলা ভাষা-সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্মরণীয় নাম। বাংলা গদ্য ভাষার বিকাশে তাঁর ভূমিকা যেমন দীপ্র, তেমনি ব্যাকরণ-অভিধান চর্চায় কেরির অবদান কোনো মতেই উপেক্ষণীয় নয়। তিনি দীর্ঘকালের প্রবল পরিশ্রমে ও আন্তরিক নিষ্ঠায় বাংলা ভাষার অভিধান বা "Dictionary of the Bengalee Language" সঙ্কলন করেন। দু' খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর এ অভিধানের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে আর ১৮২৫ সালে বের হয় প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ এবং দ্বিতীয় খণ্ড। বিপুল

আয়তনের এ শব্দকোষটি ইতঃপূর্বে প্রকাশিত ফর্‌স্টারের অভিধানের প্রায় চারগুণ এবং শব্দসংখ্যাও অনেক বেশি।

অভিধানের কলেবর এবং শব্দসংখ্যার বৃদ্ধিই উইলিয়াম কেরির প্রধান কৃতিত্ব নয়। তাঁর এ শব্দকোষের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে :

(ক) সঙ্কলিত বহু শব্দের উৎপত্তি-ব্যুৎপত্তি নির্ণয় প্রয়াস;

(খ) প্রতিটি শব্দ কোন ভাষা (সংস্কৃত, আরবি, ফার্সি, পোর্তুগিজ, ইংরেজি ইত্যাদি) থেকে আগত তার উল্লেখ;

(গ) একটি শব্দের একাধিক ইংরেজি প্রতিশব্দ প্রদান;

(ঘ) পদপরিচয় ও লিঙ্গ নির্দেশ এবং সাঙ্কে তিন বর্ণের ব্যবহার [যেমন–বিশেষ্য বিজ্ঞাপক 'S' (substantive); বিশেষণ– 'a' (adjective); ক্রিয়া বুঝাতে 'v' (verb) ইত্যাদি];

(ঙ) তাঁর অভিধানেই বাংলা বর্ণানুক্রমের আদর্শ রীতির প্রবর্তন অর্থাৎ স্বরবর্ণের পর 'ং' (অনুস্বার) এবং তারপর ' ঁ ' (চন্দ্রবিন্দু); ক-বর্ণের শেষে 'ক্ষ', ড-এর পর ড় ইত্যাদি। (স্মর্তব্য, কেরি-প্রবর্তিত এ-বর্ণানুক্রমিক রীতিই আধুনিক বাংলা অভিধানেও অনুসৃত হয়ে থাকে)।

তবে শব্দের গোত্র পরিচয়, ব্যুৎপত্তি নির্ণয়, অর্থ প্রদান ইত্যাদিতে উইলিয়াম কেরি সর্বত্র সার্থক হয়েছেন, একথা বলা যায় না এবং তিনি নিজেও সে-দাবি করেননি। শব্দের উৎস-নির্ভরতা এবং ব্যুৎপত্তির প্রতি মাত্রাতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়ার জন্যেই জীবন্ত ভাষার প্রায়োগিক ক্ষেত্রের অর্থ পরিবর্তন তাঁকে প্রতারিত করেছে কখনও কখনও (যেমন 'গলগ্রহ'-এর অর্থ দেওয়া হয়েছে— The seizing of any one by the throat.)। উনবিংশ শতাব্দির প্রথম দিকে প্রায় দুই হাজার পৃষ্ঠার অভিধানে আশি হাজারের মতো শব্দ সঙ্কলন নিঃসন্দেহে আভিধানিক উইলিয়াম কেরির বিরল কৃতিত্বের পরিচায়ক, কিন্তু তাঁর প্রদত্ত শব্দের মধ্যে দেশজ বা আঞ্চলিক শব্দের সংখ্যা খুবই কম। এবং এখানে এমন সব সন্ধিযুক্ত, সমাসবদ্ধ, নেতিবাচক শব্দ সঙ্কলিত হয়েছে যা কেবল এ কালে নয় সে-কালেও ভাষা-সাহিত্যেও খুঁজে পাওয়া ভার। যেমন, সন্ধিযুক্ত শব্দ: গণনাভিলাষী, গণনাকাঙ্ক্ষী, গণনারম্ভ, গণনেচ্ছু, গণনোচিত, গণনোদ্রেক, গণনোপযুক্ত ইত্যাদি অগণ্য শব্দ কষ্টকল্পিত সন্ধিজাত। সমাসবদ্ধ পদ :

(ক) আমাশয় মূর্দ্ধ্যকুরক্তাবাহক নাড়ী,—'The Coronary stomachic Arteries.

(খ) ইতিকর্ত্তব্যতাকলাপ,— The whole of what ought to be done in a given case.

(গ) নাবাকৃত্যস্থিছিদ্র,— One of the cavities of the ear.
(ঘ) পদবৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠনমনকারিদীর্ঘ— The name of one of the muscles which assists in moving the great toe.

এ ধরনের অভিনব সমস্ত পদ বাংলা ভাষার অভিধানে কেবল অনাবশ্যক নয়, পরিত্যাজ্যও বটে। না-বোধক বা নেতিবাচক-অ যুক্ত করে বহুক্ষেত্রে আভিধানিক অকারণে শব্দ বৃদ্ধি করেছেন : অতেমন; অব্যথা; অমদ; অমৎস্য ইত্যাদি। তবে এসব সামান্য ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বাংলা ভাষার ইতিহাসে কেরির অভিধান অসামান্য কর্মরূপে বিবেচিত হবে।

কেরির অভিধানের বিপুল আয়তন, উচ্চমূল্য এবং অনেক ক্ষেত্রে কষ্টকল্পিত অনাবশ্যক সংস্কৃত শব্দের আধিক্য, ব্যাপক পাঠক বা ব্যবহারকারীর আকর্ষণের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে তিনি নিজেও অনুভব করেছেন পরবর্তী জীবনে; ফলে তাঁর পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে এ-অভিধানের একটি সুলভ সংক্ষিপ্ত সংস্করণ প্রকাশ করেন।

জে. সি. মার্শম্যান-এর (J. C. Marshman) 'Dictionary of the Bengali Language'-এর প্রথম খণ্ড বের হয় ১৮২৭ সালে এবং দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। এ সংক্ষিপ্ত শব্দকোষে মার্শম্যান কেরির মূল অভিধানকে অনুসরণ করলেও এতে নির্মমভাবে বর্জিত হয় বহু অপ্রচলিত অপ্রয়োজনীয় শব্দ। শ্রীরামপুর প্রেসের প্রুফ সংশোধক (কেরির অভিধানের) জন মেন্ডিস (John Mendies) "Abridgment of Johnson's Dictionary, English and Bengali"— নামে অভিধান প্রকাশ করেন ১৮২২ সালে। অভিধানটির মূল উদ্দেশ্য ছিল- ইংরেজি ভাষা শিখে জ্ঞান বৃদ্ধি এবং চাকরি প্রাপ্তি।

পীতাম্বর মুখোপাধ্যায় সঙ্কলিত 'শব্দসিন্ধু' (A Sanskrit Bengali Dictionary) প্রকাশিত হয় আনুমানিক ১৮২২ সালে। এ গ্রন্থের ভূমিকা পদ্যে রচিত।

এ দেশীয় পণ্ডিত তারাদাস চক্রবর্তী সঙ্কলিত প্রথম ইংরেজি-বাংলা অভিধান "A Dictionary in Bengalee and English" প্রকাশিত হয় ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থকার কেরির বাংলা অভিধান উইলসনের সংস্কৃত অভিধান এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের 'বঙ্গভাষাভিধান'-এর প্রভাব শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।

উইলিয়াম মর্টনের (Rev. William Morton) বাংলা-ইংরেজি অভিধান মুদ্রিত হয় ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে। অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত অভিধানটির শব্দ সংখ্যা প্রায় ১৬ হাজার। শব্দকোষটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে— এখানে প্রতিটি বাংলা শব্দের একটি কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে একাধিক প্রতিশব্দ সঙ্কলন করে তার একাধিক ইংরেজি

প্রতিশব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। ফরে এ-অভিধানটি কেবল বাংলা-ইংরেজি শব্দকোষের এলাকাকে সম্প্রসারিত করে বাংলা-বাংলা ও বাংলা-ইংরেজি অভিধান হয়ে উঠেছে যুগপৎ। এর নামপৃষ্ঠায় মর্টন একটি বাংলা নামও দিয়েছেন :

"দ্বিভাষার্থকাভিধান,/or/ A Dictionary/ of the/ Bangali Language/ with/ Bengali Synonyms/ and/ An English Interpretation./ Compiled from native and other authorities."

১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে স্কুলবুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত হয় জে. ডি. পিয়ার্সনের "A School Dictionary. English and Bengalee" এবং ১৮৩০ সালে বের হয় ল্যাভেন্ডিয়ারের "Johnson's Dictionary abridged" অর্থাৎ জনসনের ইংরেজি অভিধান অবলম্বনে সংক্ষিপ্ত ইংরেজি-বাংলা অভিধান।

দ্বি-ভাষিক অভিধানের তালিকায় ফরস্টার এবং কেরির শব্দকোষের পর অন্তত আরও দুটো অভিধানের নাম উল্লেখ্য: (১) স্যার জি. সি. হটনের (Sir G. C. Haughton)- "A/Dictionary./ Bengali and Sanskrit/ Explained in English" (১৮৩৩) এবং (২) রামকমল সেনের "A/ Dictionary/ in/ English and Bengalee;/ Translated/ from/ Todd's Edition of Johnson's English Dictionary."- (১৮৩৪)।

হটনের অভিধান মূলত কোম্পানির কর্মচারী বা বাংলা ভাষা শিক্ষার্থী ইউরোপীয়দের কথা বিবেচনা করেই সঙ্কলিত হয়। তাঁর শব্দকোষে বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত আরবি, ফার্সি, হিন্দুস্থানী, পোর্তুগীজ, ইংরেজি, দেশজ শব্দ উদারভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। কেবল সাহিত্যে নয়, দর্শন ও বিজ্ঞানে ব্যবহৃত বহু শব্দ তিনি সঙ্কলন করেছেন তাঁর গ্রন্থে এবং অভিধানের পরিশিষ্টে সংযোজিত করেছেন প্রায় ৩০ হাজার শব্দের এক বিশাল তালিকা।

রামকমল সেনের অভিধানের আখ্যাপত্র থেকেই জানা যায় তাঁর ইংরেজি-বাংলা অভিধান প্রধানত জনসনের ইংরেজি অভিধানকে অবলম্বন করে সঙ্কলিত। ১৭ বছরের প্রবল শ্রমে তিনি জনসন-সঙ্কলিত অভিধানের প্রয়োজনীয় ইংরেজি শব্দের যথার্থ অর্থ বাংলা ভাষায় দেখাতে চেষ্টা করেছেন। তিনি প্রতিটি ইংরেজি শব্দের পাশে সাঙ্কেতিক বর্ণে পদনির্দেশ করে একাধিক বাংলা প্রতিশব্দ প্রদান করে অভিধানের উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছেন।

অষ্টাদশ শতাব্দ থেকে শুরু করে দ্বিভাষিক (মাঝে মাঝে ত্রি-ভাষিক) অভিধান সঙ্কলনের এ ধারা ঊনবিংশ শতাব্দ হয়ে বিংশ শতাব্দেও প্রবলভাবে বহমান এবং

তুলনামূলক বিচারে বাংলা ভাষার অভিধান চর্চা বহুলাংশে গতিহীন। এর রাজনৈতিক, আর্থ-সাংস্কৃতিক সামাজিক বা ভাষিক কারণ বিশ্লেষণ না করে আমরা এবারে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করব 'মধ্য-পর্বের' অর্থাৎ বাংলা অভিধান সঙ্কলনের উল্লেখযোগ্য ইতিবৃত্তের।

মধ্যপর্ব (বাংলা অভিধান : ১৮১৭ থেকে ১৯০০)

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ সঙ্কলিত *বঙ্গভাষাভিধান* ১৮১৭ সালে মুদ্রিত হয়। এ শব্দকোষকে বলা হয় বাংলা ভাষায় মুদ্রিত প্রথম বাংলা অভিধান। বাংলা এবং ইংরেজি ভাষায় লেখা ভূমিকায় ব্যক্ত হয়েছে আভিধানিক বিদ্যাবাগীশের দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের কথা : (১) "স্বদেশবাসীদের মধ্যে অনেকেই পত্র অথবা দলিলাদি লিখনে সাধু শব্দের অভাব অনুভব করিয়া থাকেন। এই অভাব দূরীকরণার্থ তিনি সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত প্রচলিত সকল বাঙ্গালা শব্দ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের মূল ও প্রতিশব্দসহ এই অভিধান সঙ্কলন করিয়াছেন।" [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ১৪১]। (২) এ অভিধানের সহায়তায় বাংলাভাষী মানুষের বাংলা শব্দের শুদ্ধ বানান ও তার যথার্থ অর্থ বুঝতে পারবে।

অভিধানটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়েছিল বলে অল্পকালের ব্যবধানে এর একাধিক সংস্করণ বের হয়। স্কুল বুক সোসাইটি বিতরণের জন্যে এর দু'শত কপি ক্রয় করে এবং এ গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে ৪ হাজার কপি মুদ্রণের প্রস্তাব গ্রহণ করে পিয়ার্সনের তত্ত্বাবধানে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন।

বঙ্গভাষাভিধান-এর শব্দাবলি অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত, পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫১৬। কতিপয় উদাহরণ :

১। উৎপল,	নালি	পৃষ্ঠা সংখ্যা ৭০
২। কুন্দল,	কলহ	" " ১১০
৩। চপেট,	করতল	" " ১৪৬
৪। তাহা,	সেই	" " ১৮২
৫। দারু,	কাষ্ঠ	" " ১৯৪
৬। নটী,	বেশ্যা	" " ২১৪
৭। নাই,	অভাব, নাভি, নাপিত	" " ২১৮
৮। নাটক,	নৃত্যজী, কাব্যগ্রন্থ-বিশেষ	" " ২১৯

অমরসিংহ সঙ্কলিত সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোষে'র অনুসরণে ও প্রভাবে বাংলা অভিধান চর্চার প্রথম যুগে বেশকিছু শব্দকোষ সঙ্কলিত হয়। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের শব্দসিন্ধু (১৮২২) তার প্রথম দৃষ্টান্ত। এ ধারায় আরও উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে, গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্যের *শব্দার্ণব* (১৮২৫); জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক সঙ্কলিত *শব্দকল্পলতিকা*

(১৮৩১) এবং *অমরার্থদীধিতি* (১৮৫৬)—এ গ্রন্থটি মুক্তারাম বিদ্যাবাগীশের সাহায্যে *পূর্ণচন্দ্র* পত্রিকার সম্পাদক সঙ্কলন করেন।

সংস্কৃত-প্রভাবিত এ শব্দকোষসমূহ সঙ্কলনের নেপথ্যে সর্বত্র সংস্কৃত ভাষার বিস্তার বাসনা ছিল না, তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল বাংলা ভাষার ঋদ্ধি ও বিকাশ। সংস্কৃত 'অমরকোষ'-এর বাংলা অনুবাদ 'অমরার্থদীধিতি'র ভূমিকাতেও এ বক্তব্যেরই সমর্থন মেলে : "সংস্কৃতানুযায়ী সাধু গৌড়ীয় ভাষার অনুশীলন ও উন্নতিকল্পে যত্নবান ব্যক্তিরাও উক্ত অমরকোষে জ্ঞান জন্মাইবার অভিলাষ করেন। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় ছন্দোবন্ধে ঐ কোষ প্রণীত হইয়াছে ইহাতে সংস্কৃত ভাষায় পরিজ্ঞান ব্যতীত ঐ অভিলাষ সকলের পক্ষে সুসিদ্ধ হওয়া দুর্ঘট হয়। অতএব ঐ অভিধানের যাবন্ত শব্দের পর্যায়ক্রমে লিঙ্গভেদ প্রদর্শন প্রদর্শন পূর্বক অর্থ প্রকাশ করিয়া 'অমরার্থদীধিতি' নামে এই অভিধান সংগ্রহ করা গেল" [সমাচার দর্পণ ১৮৩৮]।

বাংলাকে যথেষ্ট মাত্রায় 'সংস্কৃত' করার 'সাধু' উদ্দেশ্যে দীর্ঘকাল ধরে এ ধরনের পাণ্ডিত্য-পীড়িত ব্যাকরণ-অভিধান প্রকাশিত হতে থাকে। এর মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রাতিষ্ঠানিক প্রয়োজনে, বাংলা গদ্য ভাষার বিকাশ বিস্তারে, আইন-আদালতে এবং বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিদিনকার চাহিদায় ভাষায় নতুন নতুন শব্দের সংযোজন অনিবার্য হয়ে উঠলো এবং তার সার্থক ব্যবহারের জন্যে অপরিহার্য বিবেচিত হলো সংস্কৃত প্রভাবমুক্ত বাংলা অভিধানের। এ কালিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রকাশিত হতে থাকে বিচিত্র চরিত্রের বহু বাংলা অভিধান।

১৮৩৮ সালে জগন্নারায়ণ মুখোপাধ্যায় সঙ্কলন করেন 'নতুন অভিধান' (Nutana Abhidhana, a small Bengali Dictionary)। ১৬ হাজার শব্দের ৪৩৫ পৃষ্ঠার এ অভিধানের 'শব্দসমূহ সুনির্বাচিত এবং প্রদত্ত অর্থ সুস্পষ্ট ও সুচিন্তিত' [যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ : ১৪৮] *নতুন অভিধান* শব্দের আদ্যবর্ণের ক্রমানুসারে বিন্যস্ত এবং মূল শব্দের তুলনায় প্রদত্ত অর্থ মুদ্রণে সামান্য ছোট ম্যাপের হরফ ব্যবহৃত হয়েছে।

তারাচন্দ্র শর্মা সঙ্কলিত *শব্দার্থ প্রকাশাভিধান* মুদ্রিত হয় ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় 'পদ্মালয় যন্ত্রে'। 'সর্বলোক হিতার্থে' সঙ্কলিত এ অভিধানের শব্দসংখ্যা প্রায় সাড়ে আট হাজার, এতে বিদেশী শব্দের তেমন উপস্থিতি না থাকলেও দেশজ-আঞ্চলিক শব্দের প্রাধান্য লক্ষণীয়। যেমন : (ক) চাল— তৃণাদি-নির্মিত গৃহাচ্ছাদন-বিশেষ; (খ) ছদ্দি— বমি; (গ) ঝকড়া— কলহ; (ঘ) টাকরা— তালু; (ঙ) ঠার— আধুনিক সঙ্কেতে কথন; (চ) ডাবর— হস্তাদি ক্ষলনার্থ পাত্রবিশেষ; (ছ) ঢিলা— দীর্ঘসূত্রী; (জ) থাবা— আকুঞ্চিত সম্পূর্ণ করতল ইত্যাদি।

১৮৩১ সালে জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক *অমরকোষ* অবলম্বনে সঙ্কলন করেছিলেন *শব্দকল্পলতিকা*–সংস্কৃত অভিধান. তিনি ১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ করেন আরও একটি

ভিন্নধর্মী অবিধান *শব্দকল্পতরঙ্গিণী* নামে। বাংলা ভাষায় (তাঁর মন্তব্যে– 'প্রাকৃত ভাষা') প্রচলিত বিদেশী শব্দের সঙ্কলন এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা সঙ্কলিত এ গ্রন্থটির অভিধান অংশ দু'ভাগে বিভাজিত। প্রথম ভাগে—কিছু হিন্দুস্থানী শব্দসহ, ফার্সি, আরবি, পোর্তুগীজ ও ইংরেজি শব্দ আর দ্বিতীয় ভাগে কেবল ফার্সি ও আরবি শব্দ। শব্দসমূহ অ-ক্বারাদি বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করে অর্থ নির্দেশিত হয়েছে। শব্দকোষটির আখ্যাপত্রের কিছু অংশ নিম্নরূপ :

> শব্দকল্পতরঙ্গিণী।/ অর্থাৎ/ গৌড়ীয় সাধু ভাষা সহিত সংমিলিত পারসীয় ও আরবীয় ও ইংলণ্ডীয়/ ও হিন্দুস্থানীয় ভাষা সকলকে শব্দরূপে সংস্থান সম্বন্ধে তদর্থ/ এবং ব্যাকরণ মত ইত্যাদি সাধু প্রাকৃত ভাষায়/ শ্রী জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকেন বিরচিতা/ ... ইংলণ্ডীয় সন ১৮৩৮ সাল।

শব্দকল্পতরঙ্গিণী থেকে কতিপয় শব্দের দৃষ্টান্ত :

(ক) আফিসিয়েটিং— অস্থিত, অচিরস্থায়ী। পৃষ্ঠা সংখ্যা-১; (খ) আল্লা-ওঁ। পৃষ্ঠা সংখ্যা-২; (গ) এগ্রিমেন্ট— সন্ধিপত্র, প্রতিজ্ঞাপত্র। পৃষ্ঠা সংখ্যা–২; (ঘ) কবজ-নিদর্শন, আয়ত্ত। পৃষ্ঠা সংখ্যা –৩ (ঙ) খানসামা–ভৃত্য, প্রধান দাস। পৃষ্ঠা সংখ্যা–৫ ইত্যাদি।

আভিধানিক জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিক সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন বলে বহু ক্ষেত্রে তাঁর অর্থ প্রদান ও ব্যাখ্যা সংস্কৃত সন্ধি সমাসবদ্ধ পদের চাপে দুরূহ হয়ে উঠেছে।

আইন-আদালতে ব্যবহৃত আরবি-ফার্সি শব্দ (প্রায় তিন হাজার) সঙ্কলিত করে লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ১৮৩৮ সালে প্রকাশ করেন *ব্যবহার বিচার শব্দাভিধান* নামে আর একটি শব্দকোষ। বাংলা বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত এ অভিধানের দু'চারটে শব্দের নমুনা :

(ক) অল্লা–ঈশ্বর; (খ) আদব—সভ্যতা, নম্রতা; (গ) কাফর—পাষণ্ড; (ঘ) মাতবর—প্রধান; (ঙ) রসদ—খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ; (চ) সোলেনামা—সন্ধিপত্র; (ছ) হরদম—ক্ষণে ক্ষণে ইত্যাদি।

জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ১৮৩৮ সালে সঙ্কলন করেন *পারসীক অভিধান* / অর্থাৎ পারসীক শব্দ স্থলে স্বদেশীয় সাধু শব্দ সংগ্রহ"–নামে বাংলা ভাষায় প্রচলিত ফার্সি শব্দের অভিধান। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে 'সমাচার দর্পণের' মন্তব্য : "... ঐ গ্রন্থ দেশীয় লোকের বিশেষতঃ আদালত সম্পর্কীয় লোকদের অতি প্রয়োজনীয় হইয়াছে।" [জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ১৯৮৬ : ১০] ১২৪৫ বঙ্গাব্দে অর্থাৎ ১৮৩৮ সালে নীলকমল মুস্তোফী সঙ্কলিত আরও একটি এ-ধরনের অভিধান প্রকাশিত হয় *পারস্য ও বঙ্গীয়*

ভাষাভিধান নামে। অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে মুদ্রিত এ ফার্সি-বাংলা অভিধানের কতিপয় শব্দ : (ক) অসরাফ–বিশিষ্ট মানুষ; (খ) ইন্তিজার–আশায়, অপেক্ষায়; (গ) এয়াদ–স্মরণ, স্মৃতি, মনেকরণ ইত্যাদি।

১৮৩৯ সালে *বঙ্গভাষাভিধান* সঙ্কলন করেন রামেশ্বর তর্কালঙ্কার। চার শতাধিক পৃষ্ঠার এ অভিধানে শব্দ সঙ্কলিত হয় ১৮ হাজার। এ বছরেই প্রকাশিত হয় আর একখানি 'অভিনব' অভিধান *বঙ্গাভিধান* নামে। সঙ্কলক হলধর ন্যায়রত্ন। তিনি এ গ্রন্থে খাঁটি সংস্কৃত এবং সংস্কৃতমূলক শব্দ বর্ণানুক্রমে বিন্যস্ত করেছেন। এর অভিনবত্ব হচ্ছে, গ্রন্থকার পুস্তকের অকারণ কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় সঙ্কলিত শব্দের কোনো অর্থ প্রদান করেননি (তাঁর বিশ্বাস বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শব্দার্থ বোঝেন)। ফলে *বঙ্গাভিধান'কে* অভিধান না বলে "ছয় হাজার দুই শত চৌষট্টি শব্দ"-এর তালিকা বলাই শ্রেয়। এ গ্রন্থে তিনি আরবি-ফার্সি শব্দ বর্জন করেছেন (যেহেতু তাঁর গ্রন্থ রচনার আগেই বিদেশী শব্দের একাধিক অভিধান প্রকাশিত)। শব্দের শুদ্ধ বানান নির্দেশই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।

"বাঙ্গাল গেজিটি" যন্ত্রালয় থেকে ১৮৩৯ সালে প্রকাশিত হয় *বঙ্গভাষাভিধান* নামে আর একটি শব্দকোষ। অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত এ অভিধানের শব্দসংখ্যা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার। শব্দ সঙ্কলনে তৎসম-তদ্ভব শব্দের আধিক্য থাকলেও দেশজ বা আঞ্চলিক শব্দাবলি উপেক্ষিত হয়নি। কতিপয় উদাহরণ : (ক) অই—পূর্বস্মৃত, সম্মুখস্থিত বস্তু। (খ) কদলী—মোচাফল। (গ) খদির—বৃক্ষবিশেষের নির্যাস। (ঘ) চিকুর—কেশ। (ঙ) পাতলা—ক্ষীণ, তরল, অল্পভার। (চ) হালি—নৌকা চালনের নিয়ামক দণ্ড ইত্যাদি।

দিগম্বর ভট্টাচার্য ও শম্ভুচন্দ্র মিত্র ১৮৫২ সালে প্রকাশ করেন *শব্দার্থ প্রকাশাভিধান*। অভিধানের আখ্যাপত্রে মূল উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে— "... শব্দার্থ প্রকাশাভিধান/ সর্বলোক হিতার্থে/ নিয়ত গৌড়ীয় সাধু ভাষায়/ অকারাদি ক্ষ/ কারন্ত সার্থক শব্দ সঙ্কলন পূর্বক/"। কাশীনাথ ভট্টাচার্য সঙ্কলিত 'বঙ্গ ভাষাভিধান' প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে। প্রধানত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের কথা বিবেচনা করে আভিধানিক তার শব্দকোষে তৎসম, তদ্ভব, দেশী-বিদেশী প্রায় ২০ হাজার শব্দ অর্থসহ অকারাদি বর্ণানুক্রমে সঙ্কলিত করেন। নমুনা হিসেবে কয়েকটি শব্দ অর্থসহ তুলে দেওয়া হলো : (ক) আণ্ডা, অণ্ড, ডিম্বকোষ। (খ) কঙ্গ, মৎস্য বিশেষ। (গ) ঝাঁপ, তৃণাদি নির্মিত আবরণ। (ঘ) থুথনী, চিবুক, ওষ্ঠের অধোভাগ। (ঙ) নানী, মাতামহী। (চ) পঁইচা, অলঙ্কারবিশেষ, কাঙ্কন। (ছ) ফিকা, পাণ্ডুর, ম্লান। (জ) মস্তানা, মাতাল, লম্বট। (ঞ) রোকড়িয়া, বানিয়া ইত্যাদি।

১৮৬১ সালে ৪০ হাজারের অধিক শব্দ সঙ্কলন করে কেশবচন্দ্র রায় কর্মকার প্রকাশ করেন তাঁর বিখ্যাত অভিধান *শব্দার্থ প্রকাশিকা*। এ গ্রন্থ প্রস্তুত করতে তিনি

সাহায্য নিয়েছিলেন পণ্ডিত কেদারনাথ ভট্টাচার্য ও যদুনাথ চট্টোপাধ্যায়ের। অভিধানটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করার ফলে একাধিক সংস্করণ বের হয় কয়েক বছরের (১৮৬৬ সালে, ৩য় সংস্করণ) মধ্যে। অ-কারাদি বর্ণানুক্রমে সজ্জিত এ শব্দকোষটি কেবল 'শব্দার্থ' প্রকাশেই সীমাবদ্ধ নয়, প্রায় প্রতিটি তৎসম ও তদ্ভব শব্দের ব্যুৎপত্তি দেওয়া হয়েছে এ গ্রন্থে। আভিধানিক 'শব্দাম্বধি' 'শব্দকল্পদ্রম', উইলসনের সংস্কৃত অভিধান এবং কেরির বাংলা-ইংরেজি অভিধান থাকা সত্ত্বেও কেন এ কাজে ব্রতী হলেন তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন :

> "... বঙ্গ ভাষার উত্তমরূপ পরিজ্ঞানার্থ যে শব্দ যে ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা জ্ঞাত হওয়া নিতান্ত আবশ্যক, কিন্তু শব্দাম্বুধি প্রভৃতি বঙ্গীয় অভিধানে তাদৃশ নিয়মে ধাতু সকল বিবৃত না থাকায় অনেকানেক সাধু ভাষাধ্যায়ী সাধুগণের শব্দার্থ সাধন বিষয়ে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি জন্মে না। এই হেতু সকল শব্দের ধাতু এবং অর্থ সহিত 'শব্দার্থ প্রকাশিকা' নামে এই অভিনব অভিধান সংগৃহীত হইল [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৮ : ১৩]।

এ অভিধানে তৎসম-তদ্ভব দেশজ শব্দের সঙ্গে সঙ্কলিত হয়েছে বেশ কিছু আরবি, ফার্সি, ইংরেজি ইত্যাদি বিদেশী শব্দও। যেমন : আপিল; কমিজ; চাবী; ছেঁচোড়; জবর; নগদ; পনীর; বাজী; বাগিচা; বেইমান ইত্যাদি।

১৮৬৩ সালে প্রকাশিত হয় মথুরানাথ তর্করত্ন সঙ্কলিত *শব্দসন্দর্ভ সিন্ধু* অভিধান। দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ এ অভিধানে ইংরেজি শব্দকোষের সঙ্কলন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং বাংলা সাহিত্য থেকে দৃষ্টান্ত ব্যবহার করে শব্দের প্রয়োগ পদ্ধতি দেখিয়েছেন, যা ইতঃপূর্বে কোনো বাংলা অভিধানে পাওয়া যায় না। তিনি শব্দের সংক্ষেপীকরণের (Abbreviation) জন্যে ইংরেজি অভিধান অনুসরণে 'ফুলস্টপ' (.)-ব্যবহার করেছেন: বিশেষ্য- বি.; বিশেষণ- বিন.; স্ত্রীলিঙ্গ- স্ত্রী. ইত্যাদি। মথুরানাথ তর্করত্নের এ বিখ্যাত অভিধান থেকে সামান্য নমুনা :

(ক) অকথা, স্ত্রী. বি. (অ-কথ, বাক্য, ঙ) অপভাষা; অকথক; কুকথা; মন্দকথা। পৃ-১০

(খ) অগো, (ব্য) প্রধান ব্যক্তির সম্বোধন। যথা-
"... কাঁদি কহে অগো রাজকুমারী।
ক্ষম অপরাধ আমি তোমারি ॥ —ভারতচন্দ্র।
সম্বোনার্থ অব্যয় শব্দ। পৃ-১৮

(গ) অঙ্গগ্রহ, পু. বি. (অঙ্গগ্রহ, গ্রহণ. অল) আকর্ষণী; গাত্রবেদনা; গাত্রকামড়ান; ইতি বৈদ্যশাস্ত্র।

(ঘ) আড়বাড়, ক্রি-বিল. (আড়-বাড়, স্থান, অল) সর্বত্র; সকল স্থান; সমস্ত স্থান; ইতিশব্দ রত্নাবলী। পৃ-২২৬

(ঙ) ওড়না, ক্রি. বিণ. (হিন্দী) উত্তরীয় বসন; উড়ানী, যথা—

উড়িছে ওড়না বাস ইতি কর্মদেবী ২৫ পৃষ্ঠা। পৃ-৩১৩ ইত্যাদি।

নন্দকুমার কবিরত্নের সাহায্যে বেণীমাধব দাস সঙ্কলন করেন 'শব্দার্থ মুক্তাবলী' নামে ৬০ হাজারের অধিক শব্দের অভিধান ১৮৬৪ সালে। বর্ণানুক্রমে সজ্জিত এ অভিধানে দুই'ব' কে পৃথকভাবে দেখানো হয় নি, যেহেতু বাংলা উচ্চারণে বর্গীয় ও অন্তঃস্থ 'ব'- এর কোনো পাথক্য নেই। এ শব্দকোষে "বাংলা ভাষায় প্রচলিত যাবতীয় অর্থাৎ তৎসম, তদ্ভব, দেশজ, আরবি, ফার্সি, ইংরেজি ইত্যাদি শব্দকে স্থান দেওয়া হয়েছে। দু'খণ্ডে সমাপ্ত এ অভিধানে "সর্বাগ্রে মূল শব্দ, তৎপরে তাহার লিংগ, তৎপশ্চাৎ তাহার শব্দবিভাগ কদাপি ধাতু ও প্রত্যয়, এবং অবশেষে মূল শব্দের যাবতীয় প্রসিদ্ধ অর্থ ও তৎপর্যায়িক শব্দ সকল প্রকাশিত হয়েছে।" এ গ্রন্থের দীর্ঘ উপক্রমণিকায় ভাষার বিবরণ ও ব্যাকরণ সংক্রান্ত আলোচনা সন্নিবেশিত হয়েছে।

ঢাকা নর্মাল স্কুলের পণ্ডিত শ্যামাচরণ চট্টোপাধ্যায় ১৮৬৪ সালে সঙ্কলন করেন *শব্দদীধিতি*- নামে একটি অভিধান। সম্ভবত ঢাকা থেকে প্রকাশিত এটিই প্রথম বাংলা অভিধান । যদিও আখ্যাপত্রে বিবৃত হয়েছিল : "Shubda Didhitee./ A / Dictionary / in / Sanscrit and Bengali /" — কিন্তু আভিধানিকের ভূমিকা পড়ে বোঝা যায় তাঁর অভিধান সঙ্কলনের মুখ্য উদ্দেশ্য :

> দিন দিন বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি ও তৎসঙ্গে সঙ্গেই বিবিধ নূতন শব্দ ব্যবহৃত হইতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় বিবিধ ভাব প্রকাশক শব্দের অত্যন্ত অভাব আছে, সুতরাং বাঙ্গালা গ্রন্থপ্রণেতা মাত্রেই নূতন নূতন শব্দ প্রণয়ন ও অনেক অব্যবহৃত শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, সেই সমুদায় শব্দের অর্থ প্রায় কোন অভিধানেই পাওয়া যায় না,তন্নিমিত্ত বাঙ্গালা পাঠকগণের নিকট এই ভাষা সময়ে সময়ে এক অভিনব ভাষা বলিয়া প্রতীয়মান হয়; আমি সেই অভাব পরিহারে কৃত সংকল্প হইয়া প্রথমতঃ নানাবিধ বাঙ্গালা পুস্তক পাঠ করিয়া বহু সংখ্যক নূতন শব্দ সংগ্রহ করিযা ধাতু ও লিঙ্গ সহিত শব্দদীধিত নামে এই অভিধানখানি প্রচারিত করিলাম।

উদ্ধৃতাংশ বৃদ্ধি না করেও আভিধানিকের দৃষ্টিভঙ্গি এবং শব্দ নির্বাচন বা সঙ্কলন পদ্ধতি উপলব্ধি করা আদৌ শক্ত নয়। এ-অভিধানেও দু'টো ব-এর পার্থক্য করা হয়নি এবং 'ক্ষ'-কে 'ক'-এর পরে স্থান দেওয়া হয়েছে।

১৮৬৬ সাল শিক্ষার্থীদের হিতার্থে রামকমল বিদ্যালঙ্কার সঙ্কলন করেন দু'শতাধিক পৃষ্ঠার *প্রকৃতিবাদ অভিধান*। উইলসনের সংস্কৃত অভিধান. রাধাকান্ত

দেবের *শব্দকল্পদ্রুম* এবং অমরকোষ-এর বিভিন্ন টীকাগ্রন্থ ছিল এর মূল অবলম্বন। শব্দকোষটি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে বলে একাধিক সংস্করণ বের হয় পরবর্তীকালে। ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ দিকে প্রকাশিত হয় আরও কয়েকটি বাংলা অভিধান, যার মধ্যে *নতুন শব্দার্থ প্রকাশিকা* (১৮৭৪), *বাংলা অভিধান* (১৮৯০) বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

আধুনিক পর্ব (১৯০১- থেকে)

বিংশ শতাব্দের সূচনা-লগ্ন থেকে বাংলা-ভাষা সাহিত্যের দ্রুত ঋদ্ধি, সংবাদপত্র সাময়িকপত্রের সংখ্যা বৃদ্ধি, আইন-আদলতে, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে, জ্ঞান-বিজ্ঞান, ধর্ম দর্শনের বিতর্ক-বিচারে অর্থাৎ বাঙালী-জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় তীব্রভাবে। ফলে সঙ্গত কারণেই বাংলাভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান চর্চার ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়ের। নানা আকারে বিচিত্র উদ্দেশ্যে বাংলা ভাষায় সঙ্কলিত হতে থাকে বহুবিধ পরিভাষা কোষগ্রন্থ এবং অভিধান। আমরা তার দীর্ঘ তালিকা বা বিবরণ প্রদান করে অকারণ প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করতে আগ্রহী নই, তার চেয়ে এ -শতাব্দে সঙ্কলিত কতিপয় স্মরণীয় অভিধানের নাম উল্লেখ করে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের অভিধান আলোচনায় ব্রতী হতে চাই।

বিংশ শতাব্দের প্রারম্ভে সঙ্কলিত অভিধানের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য সুবলচন্দ্র মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান* (প্রথম সংস্করণ ১৯০৬, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯০৯ সালে) প্রথম সংস্করণে তিনি শব্দকোষের সঙ্গে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক বহু চরিত্রের জীবন বৃত্তান্ত প্রদান করেন। বাংলা অভিধানের জীবনচরিত সংকলন এটাই প্রথম। অভিধানটির অত্যধিক জনপ্রিয়তা হেতু ১৯০৯ সালে পরিমার্জিত ও বর্ধিত আকারে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় সংস্করণ; তৃতীয় সংস্করণও হয় অল্পদিনের ব্যবধানে। এ ব্যাপক জনপ্রিয়তার কারণ অবশ্য কেবল মূল অভিধানাংশ নয়, এর পরিশিষ্টে সংকলিত নানা ধরনের অত্যাবশক বিষয় যেমন— (১) সংস্কৃত ও বাংলা গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ, (২) আদালতে এবং মহাজনী ও জমি সেরেস্তায় ব্যবহৃত কতিপয় আরবি-ফার্সি, ইংরেজি শব্দ, (৩) সংস্কৃত প্রবাদ (বাংলা ভাষায় প্রচলিত); (৪) প্রবাদ ও প্রবচন, (৫) বাংলা উপন্যাস নাটকাদির চরিতাবলী (৬) জীবন চরিত্র (৭) ভিন্ন ভিন্ন টাইপের পরিচয়, এবং সংশোধন পদ্ধতি ইত্যাদি। সুতরাং সুবলচন্দ্র মিত্রের *সরল বাংলা অভিধান*, সীমিত অর্থে সেদিনের বাঙ্গালীকে বিশ্বকোষ-এর স্বাদ এনে দিয়েছিল। দীর্ঘকালের বিশ্রামবিহীন জীবনপাত পরিশ্রম ও একক প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত অভিধানটি সাম্প্রতিককালের পণ্ডিত সমাজে কেন যে এতো উপক্ষিত ও অবহেলিত সেটাই বিস্ময়ের বিষয়। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস, হরিচরণ

বন্দোপাধ্যায় তাঁদের অভিধানের ভূমিকা বা প্রস্তাবনা অংশে অনেক অখ্যাত স্বল্পখ্যাত আভিধানিকের নাম উল্লেখ করলেও সুবল মিত্রের নাম সেখানে অনুপস্থিত। সাম্প্রতিককালের প্রগতিশীল ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরাও এক বাক্যে বলে দেন, সুবল মিত্র সংস্কৃত-পন্থী; তাঁর অভিধান মূলত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের অভিধান। এ নিবন্ধে আমরা এর বির্তক-বিচারে প্রবৃত্ত হবো না, কেবল স্মরণ করবো সেই সাধারণ মানুষটিকে যিনি মাতৃভাষায় বিকাশের জন্যে জাতীয় জীবনের বহুবিধ জিজ্ঞাসার উত্তর অন্বেষণে, অসাধারণ অনন্য নিষ্ঠা ও শ্রমে নিজের জীবনকে সংক্ষিপ্ত করে (মাত্র ৪১ বছর বেঁচেছিলেন) সঙ্কলন করেছিলেন *সরল বাঙ্গালা অভিধান*। কৌতূহলী পাঠকদের জন্যে পণ্ডিত-কথিত এ সংস্কৃতপন্থী অভিধানের 'অ' এবং আ' থেকে কতিপয় শব্দ তুলে দিচ্ছি :

অকু; অকেজো; অখন (এখন); অগারাম; অঘাট; অঘাসি (মন্দঘাস);

অঘা; অচিন; অচেনা; অজানা; অদলবদল; আই; আইড়; আইন-কানুন; আইনবাজ; আইল; আইশাশ; আইস (এসো); আউড় আওরৎ; আওয়াজ; আওড়ান; আঁকাশি; আঁকুপাঁকু; আঁচড় আঁড়ত; আগমোড়া; আড়াআড়ি ; আড়াল; আতর, আতস; আথাল: আথাল-পাথাল; আদৎ, আদত; আদপে; আদব-কায়দা; আদম,আদল; আদাড়; আদায়: আদুল; আধলা; আপেল; আবডাল; আবার, আমির; আল্লা ইত্যাদি।

আভিধান- ব্যাকরণে সংস্কৃতের প্রবল প্রতাপে বীতরাগ বাংলা ভাষানুরাগী রজনীকান্ত বিদ্যাবিনোদ সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ পরিহার করে ১৯০৭ সালে সঙ্কলন করেন বাংলা অভিধান *বঙ্গীয় শব্দসিন্ধু* নামে। সচেতনভাবে দেবভাষা বা সংস্কৃত শব্দ বর্জন করে বাংলা লৌকিক বা খাঁটি বাংলা শব্দের অভিধান সঙ্কলন করেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি ১৯১৫ সালে 'বাঙ্গালা শব্দকোষ' নামে। দু'বছরে প্রকাশিত অভিধানের ৪ খণ্ডে দেওয়া হয়েছে বহু শব্দের ব্যুৎপত্তি; দেখানো হয়েছে অর্থবৈচিত্র্য এবং ক্ষেত্র' বিশেষে প্রয়োগ দৃষ্টান্তে স্পষ্ট করতে চাওয়া হয়েছে অর্থের পার্থক্য। তবে বাংলা ভাষায় আত্মীকৃত বা প্রচলিত সংস্কৃতমূলক শব্দ বর্জন করে এবং সার্বিকভাবে আভিধানিক শৃঙ্খলার শৈথিল্যে এ- অভিধানটি তেমন পরিচিতি ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি।

বাংলাভাষার অভিধান সঙ্কলনে সংস্কৃতমূলক শব্দ ও ব্যাকরণ বিধির প্রতি অন্ধ আনুগত্য যেমন বাংলা ভাষার স্বাধীন বিকাশকে ব্যাহত করে, তেমনি দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত বা অঙ্গীভূত তৎসম শব্দাবলি বর্জনও ভাষাকে পঙ্গু করে যুগপৎ। ফলে জীবন্ত বাংলা ভাষায় নিত্য ব্যবহৃত তৎসম, তদ্ভব, অর্ধতৎসম, দেশজ আঞ্চলিক কিংবা বৈদেশিক (আরবি, ফার্সি, ইংরেজি ইত্যাদি) তাবৎ শব্দ বাংলা অভিধানে সমান গুরত্বের সঙ্গে সঙ্কলিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ মহান আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বহু বছরের একান্ত সাধনায়, একক প্রচেষ্টায় জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস প্রথমে সঙ্কলন করেন ৭৫ হাজার শব্দের (দু' খণ্ডে) বিশাল *শব্দকোষ বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* ১৯১৭ সালে। এবং এর পরিমার্জিত পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ (শব্দ সংখ্যা - ১ লক্ষ ১৫ হাজারের বেশি) প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে। বাংলা ভাষায় বৈশেষিক বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত লক্ষাধিক শব্দের এ বৃহত্তম শব্দকোষ বাংলা অভিধানের ইতিহাসে এক যুগান্তরকারী ঘটনা আজ পর্যন্ত; *বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান* শব্দসংখ্যার দিক দিয়ে অনতিক্রমণীয় রয়ে গেছে।

এরপর আর একখানি বিশাল অভিধান সঙ্কলন করেন হরিচরণ বন্দ্যোপধ্যায় প্রায় ৩০ বছরের অসামান্য শ্রমে ও অনন্য নিষ্ঠায়। প্রথম দিকে ধারাবাহিকভাবে ১০৫ ভাগে বিভক্ত করে প্রকাশিত হয় *বঙ্গীয় শব্দকোষ* (১৩৪০ সন থেকে ১৩৫৩ পর্যন্ত)। ১৯৪৫ খ্রিষ্টাব্দে ৫ খণ্ডে বিভক্ত করে সম্পূর্ণ শব্দকোষটি প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী থেকে। ১৯৬৬ সালে সাহিত্য অকাদেমি' নতুন দিল্লী থেকে (২ খণ্ডে সম্পূর্ণ) *বঙ্গীয় শব্দকোষ* প্রকাশিত হয়, আর এর পুনর্মুদ্রণ হয় ১৯৭৮ সালে। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান*-এর মতোই হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এ *বঙ্গীয় শব্দকোষ* বাংলা অভিধান-চর্চার ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় গ্রন্থ।

যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রূপান্তরিত হয় জীবন্ত ভাষা, জীবনে এবং সাহিত্যে শব্দের অর্থান্তর, অর্থসংকোচন কিংবা সম্প্রসারণ হয়ে ওঠে অবশ্যম্ভাবী। ভাষার রীতিতে, বানানে, বাকবিন্যাসে, শব্দযোজনার এ-কালিক পরিবর্তনে প্রয়োজন হয় নতুন যুগের নতুন অভিধান। আমাদের মনে রাখা দরকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন-হরিচরণের অভিধান সঙ্কলনের পর প্রকাশিত হয়েছে অনেকগুলো বিখ্যাত পত্রিকা এবং কালজয়ী গ্রন্থ। বানান সংস্কার করেছে বিশ্বভারতী ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান সংস্কার সমিতি। ফলে বিপুল আয়তনের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* ও *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এর জন্যে শ্রদ্ধার আসন অবিচল রেখেই ভাষিক প্রয়োজনে ব্যবহারিক সুবিধার্থে রাজশেখর বসু সঙ্কলন করেন *চলন্তিকা* আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান। ২৬ হাজার শব্দের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৩০ সালে এবং 'ত্রিশ হাজারের অধিক সংস্কৃত, সংস্কৃতজাত, দেশজ ও বিদেশী শব্দের বিবৃতি'-সহ প্রকাশিত হয় ত্রয়োদশ সংস্করণ ১৯৭৩ সালে। *চলন্তিকার* বিপুল জনপ্রিয়তার পর ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হয় কাজী আবদুল ওদুদের *ব্যবহারিক শব্দকোষ* 'বাংলা ভাষার অভিনব অভিধান' এবং এর 'বহুল সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণে'র শব্দসংখ্যা প্রায় ৬৪ হাজার'। "বাংলার মুসলমান-সমাজে প্রচলিত অথচ বাংলা অভিধানে সাধারণতঃ অচলিত শব্দগুলোও সংকলন করতে চেষ্টা করা হয়েছে।"—এটাই কেবল *ব্যবহারিক শব্দকোষ*-এর বৈশিষ্ট্য নয়, আভিধানিক কাজী আবদুল ওদুদ সংক্ষপ্ত পরিসরে প্রায় প্রতিটি শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্দেশও করেছেন সহজবোধ্য পদ্ধতিতে। এরপর শৈলেন্দ্র

বিশ্বাস সঙ্কলিত *সংসদ বাংলা অভিধান* প্রকাশিত হয় ১৯৫৫ সালে। প্রথম সংস্করণে শব্দসংখ্যা ৪০ হাজার থাকলেও পরবর্তী সংশোধিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণসমূহে শব্দসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তবে এ-তিনটি অভিধানের মধ্যে *চলন্তিকা* এবং *সংসদ বাংলা অভিধান* সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

১৯৭১ সালের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের পর প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এবং একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হয় বাংলা। ফলে স্বাধীন দেশের সর্বস্তরে বাংলা চালু হওয়ায় বিচিত্র ধরনের শব্দকোষ সঙ্কলিত হতে থাকে। বাংলাদেশ হওয়ার আগেই ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লার সম্পদনায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছিল *আঞ্চলিক ভাষার অভিধান*। এরপর বাংলাদেশের বাংলা একাডেমী থেকে ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে (১) *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান* (২) *যথা শব্দ (সমার্থ শব্দকোষ)* (৩) *ছোটদের অভিধান* (৪) *চরিতাভিধান* (৫) *বাংলা উচ্চারণ আবিধান* (৬) *সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান* ইত্যাদি। এ-সব অভিধান এবং বিচিত্র কোষগ্রন্থের জনপ্রিয়তা বা প্রয়োজনীয়তা আদৌ কম নয়, তা বোঝা যায় অল্পদিনের মধ্যে এগুলোর একাধিক মুদ্রণ ও সংস্করণে।

॥ তিন ॥ 'বাঙ্গালা ভাষার অভিধান' ও 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান আলোচনার সূচনায় আমাদের জানা দরকার এ-মহৎ কর্ম সম্পদনার নেপথ্যে তাঁদের আদর্শ ও উদ্দেশ্য কী ছিল ? কারণ অভিধান মূল্যায়নে— শব্দনির্বাচন; বর্ণক্রম; বানান নির্ধারণ; উচ্চারণ শব্দার্থ নির্দেশ; পদপরিচয়; ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যা; সমার্থশব্দের উল্লেখ; প্রয়োগ দৃষ্টান্ত ইত্যাদি বিষয় যতই জরুরি বিবেচিত হোক না কেন, এ সব কিছুই নিয়ন্ত্রিত বা নির্ধারিত হয় সঙ্কলকের উদ্দেশ্য ও আদর্শের দ্বারা। সুতরাং অভিধান আলোচনার প্রারম্ভে উদ্ধার করা দরকার বাংলাভাষার এ দু'জন মহান আভিধানিকের প্রত্যাশা ও পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যকে। আমরা এ-ব্যাপারে কোনো বিদগ্ধ ভাষাবিজ্ঞানীর মন্তব্য স্মরণ না করে জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণের বক্তব্যের সারাৎসার সঙ্কলনকে শ্রেয় বিবেচনা করি। এ ক্ষেত্রে আমাদের অবলম্বন, *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*— জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলিত ও সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ প্রকাশিত, দ্বিতীয় সংস্করণের পুর্নমুদ্রণ - ১৯৮৬ এবং *বঙ্গীয় শব্দকোষ*—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি: নতুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত (১৯৬৬) এর পুর্নমুদ্রণ ১৭৮।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস তাঁর অভিধানের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বিবৃত করেছেন :

(১) প্রথম সংস্করণ-কালেই সংস্কৃত বাঙ্গালা আভিধানের আদর্শে গড়িয়া না তুলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার অভিধানকে খাঁটি বাঙ্গালা অভিধানে পরিণত করিবার কোন চেষ্টারই ত্রুটি করা হয় নাই।" পৃষ্ঠা-১

(২) "ইতিপূর্বে কোন বাঙ্গালা অভিধানে শব্দের উচ্চারণ প্রকাশিত করিবার প্রথাই ছিল না। ... প্রত্যেকটি শব্দ স্বত উচ্চার্য্য করিবার জন্য বর্ণ শীর্ষে উচ্চারণ-দ্যোতক উদ্ভাবিত চিহ্ন প্রকটিত করা হইল; এবং একটি বিস্তারিত উচ্চারণ-কুঞ্চিকা গ্রন্থের প্রারম্ভকালে ও তাহার সংক্ষিপ্তসার প্রতি গৃষ্ঠাতলে সর্ব্বসাধারণের সুবিধার্থ সন্নিবেশিত হইল।" পৃষ্ঠা- ১-২

(৩) "শব্দ-প্রয়োগ- প্রদর্শন স্থলে সংস্কৃত গ্রন্থাদি হইতে বাক্য বা বাক্যাংশ উদ্ধার না করিয়া প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক বাঙ্গালা গ্রন্থ-পত্রাদি, প্রবাদ, দলীল, নথিপত্র, গীত, পদাবলী, গ্রাম্যছড়া, গাথা ও দোহাদির অংশোদ্ধার, প্রচলন বাহুল্যে বঙ্গভূত বৈদেশিক শব্দাদি গ্রহণ, সংস্কৃত ব্যাকরণনুমোদিত সূত্রসিদ্ধ কিন্তু বঙ্গভাষা ও সাহিত্য অপ্রচলিত এরূপ শব্দ... বর্জন।" পৃষ্ঠা-২

(৪) "... সর্ব্বসাধারণের প্রয়োজন-সাধকতা (utility) এবং শব্দাভিধানের (lexcon) উপযোগিতার উৎকর্ষবিধানের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এবং সুভ্যজগতের বিশ্বভাষা ভাণ্ডারের প্রধান প্রধান শব্দকোষের পার্শ্বে এই অতি প্রাচীন সভ্য জাতি বাঙ্গালীর সাগর-বিশাল মাতৃভাষার অভিধানের স্থান ও মর্যাদার প্রতি অবহিত থাকিয়া ইহার দ্বিতীয় সংস্করণ সম্পাদন করিতে শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে যত্নের ত্রুটি করি নাই।" পৃষ্ঠা-২-৩

(৫) "... বাঙ্গালা শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণানুমোচিত গঠন ধারাই একমাত্র অবলম্বনীয় হইতে পারে না।" পৃষ্ঠা-৫

(৬) অর্থগত না হইয়া শব্দগত লিঙ্গানুশাসন স্ত্রীলিঙ্গাবচক ও ক্রিয়ান্বয়ী বিশেষণ প্রয়োগ পদ্ধতি যে কোন ভাষাকে জটিল করিয়া তুলে। তাহা মৃত ভাষার অলঙ্কারস্বরূপ অপরিহার্যভাবে বিরাজ করিতে পারে, কিন্তু বাঙ্গালার ন্যায় জীবন্ত ভাষায় উক্ত অনুশাসনের একান্ত প্রয়োজন আছে বলিয়া স্বীকৃত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।" পৃষ্ঠা-৯

(৭) প্রাচীন মধ্য ও আধুনিক শব্দসম্বলিত বৃহৎ অভিধান জাতীয় সংস্কৃতি বা কৃষ্টির স্তরক্রম। ... ব্যাকরণ ও অভিধান মানবজাতির সকল জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যে অনুর্গামী হয় এবং উভয় জাতীয় জীবনে বর্তমানের প্রয়োজনসাধক, ভবিষ্যতের ভিত্তিভূমি ও নবনব সংস্করণের যোগ্য হইয়া থাকে।" পৃষ্ঠা-১২

(৮) অভিধানের ন্যায় সর্বজন প্রয়োজনীয় গ্রন্থ সম্পূর্ণ নির্ভুল করিবার বাসনা ও প্রচেষ্টাই অভিধানকারের প্রধান কর্ম্ম ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম।" পৃষ্ঠা-১৩

প্রাগুক্ত আদর্শ এবং উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আভিধানিক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস সঙ্কলন করেন *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*। বাংলা ভাষার স্বাধীন বিকাশে বিশ্বাসী জ্ঞানেন্দ্রমোহন প্রগুক্ত ঘোষণাকে রূপায়ণের জন্যে অভিধান সঙ্কলনের গতানুগতিক ধারাকে অতিক্রম করে স্বাতন্ত্র্য দেখালেন :

(ক) শব্দনির্বাচনে, (খ) ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ে, (গ) উচ্চারণ নির্দেশে, (ঘ) শব্দার্থের বৈচিত্র্যে ও প্রয়োগ-দৃষ্টান্তে, (ঙ) পদপরিয় ও শব্দের গোত্র নির্ধারণে। এবং গ্রন্থ শেষে মূল্যবান পরিশিষ্টে (সংযোজন-সংশোধন বাদে ১৫টি যোজনা) জাতীয় জীবনে এর উপযোগিতা বৃদ্ধি করেছে নিঃসন্দেহে। তবে তাঁর তাবৎ আয়োজন ও উদ্দেশ্য যে সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করেছে এমন দাবি তিনি নিজে কখনও করেননি, আমরাও করি না। কারণ এ কথা সর্বজন স্বীকৃত সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন নির্ভুল অভিধান প্রায় আকাশ কুসুমের মতোই অবাস্তব; বহু বিশেষজ্ঞের নিরন্তর সংশোধন এবং ধারাবাহিক সংযোজনের মধ্যে দিয়েই যে কোনো জীবন্ত ভাষার অভিধান তার ব্যবহারযোগ্যতা বজায় রাখে।

এবারে আমরা *বঙ্গীয় শব্দকোষের* সঙ্কলক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আদর্শ-উদ্দেশ্য এবং তাঁর শব্দকোষের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরতে চেষ্টা করবো [সাহিত্য অকাদেমি। নতুন দিল্লী থেকে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণ-১৯৭৮ অভিধানের] সঙ্কলয়িতার নিবেদন থেকে :

(১) "... কবিবর (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) আমাকে বাংলাভাষার একখানি অভিধান প্রণয়নের কথা বলিয়াছিলেন। ... আমি তদীয় অনুমতিক্রমে অভিধান রচনায় নিরত হইলাম। অভিধান প্রণয়নের ইহাই মূল কারণ।" পৃষ্ঠা-১৫

(২) "... নৈরাশ্যে হতবুদ্ধি হই নাই, পরিশ্রমের পুরস্কার আছেই এই বিশ্বাসে কার্য্যে বিরত হইলাম না। ঠিক জানি, (অভিধান) মুদ্রিত না হইলেও যদি জীবনান্ত না হয় তবে, অভীষ্ট গ্রন্থ একদিন না একদিন মুদ্রাঙ্কিত হইয়া আমার ইচ্ছানুরূপ পূর্ণাঙ্গ হইবে।"
পৃষ্ঠা-১৭

(৩) "... এই অভিধানে কি আছে এবং কি প্রণলীতেই বা রচিত হইয়াছে, তাহাই কিঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়া বিচারক সুধীজনের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি, তাঁহাদের বিচারই ইহার উৎকর্ষাপকর্ষের নিকষপাষাণ।" পৃষ্ঠা-১৭

এরপর আভিধানিক অভিধানের বিষয় এবং সঙ্কলন পদ্ধতির বিস্তারিত বিবরণে উল্লেখ করেছেন :

(ক) বৌদ্ধগান ও দোহা থেকে আরম্ভ করে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বিখ্যাত গ্রন্থ থেকে আবশ্যক বা উল্লেখযোগ্য প্রায় সমস্ত শব্দই শব্দকোষে সঙ্কলন করেছেন।

এবং শব্দের অর্থ সমর্থনের জন্যে প্রচুর প্রয়োগ দেখিয়েছেন সাহিত্য থেকে।

(খ) "বাঙলায় প্রচলিত আরবী ফারসী ইংরাজী পোর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষান্তরের শব্দসমূহের বিশুদ্ধ মূলরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে।" পৃষ্ঠা-১৭

(গ) "বাঙলায় প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃত শব্দের পাণিনি অনুসারে ব্যুৎপত্তি সমাস বিষদভাবে লিখিত হইয়াছে।" পৃষ্ঠা-১৭

(ঘ) "বাংলায় প্রচলিত শব্দসমূহ ভিন্ন, সাধারণ সংস্কৃত সাহিত্যে প্রযুক্ত শব্দাবলীর বিচারপূর্বক অর্থ নির্ণয় করিয়া প্রয়োগসমূহ উদ্ধৃত হইয়াছে; সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে, এই অভিধানে সংস্কৃত পাঠার্থীরও বিশেষ উপকার হইবে এবং এই উদ্দেশ্যেই ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।" পৃষ্ঠা-১৭/১৮

প্রসঙ্গক্রমে নিবেদনে বর্ণিত হয়েছে শব্দকোষের শব্দবিন্যাসাদি : বানান; উচ্চারণ; ব্যুৎপত্তি ও অর্থ; পদপরিচয়; ধাতু; শিষ্ট প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান ও *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এর এ দুজন মহান সঙ্কলকের বক্তব্য বিশ্লেষণ করলেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ধরা পড়ে। যেমন জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস যেখানে স্পষ্ট ঘোষণা করেন, খাঁটি বাঙ্গালা অভিধানে পরিণত করিবার কোনো চেষ্টারই ত্রুটি করা হয় নাই এবং বাঙ্গালা শব্দের বুৎপত্তি নির্ণয়ের জন্য সংস্কৃত ব্যাকরণানুমোদিত গঠন ধারাই একমাত্র অবলম্বনীয় হইতে পারে না—সেখানে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিবেদন করেন : "বাঙলায় প্রচলিত সমস্ত সংস্কৃত শব্দের পাণিনি অনুসারে ব্যুৎপত্তি ও সমাস বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।" তাঁর লক্ষ্য ছিল "এই অভিধানে সংস্কৃত পাঠার্থীরও বিশেষ উপকার হইবে এবং এই উদ্দেশ্যেই ঐ সকল সংস্কৃত শব্দ সঙ্কলিত হইয়াছে।"

সুতরাং জ্ঞানেন্দ্রমোহনে খাঁটি বাঙ্গালা অভিধান সঙ্কলনের প্রত্যাশা যতোটা তীব্র এবং সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্ধ আনুগত্য যেমন অসহনীয়—হরিচরণের বঙ্গীয় শব্দকোষ-এ বাংলাভাষা প্রীতি প্রগাঢ় হলেও সংস্কৃত ভাষা ও তার ব্যাকরণবিধির প্রতি সীমাহীন অনুরক্তির স্বাক্ষর মেলে সর্বত্র। জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধান পরিকল্পনার সবটা জুড়ে রয়েছে– সভ্যজগতের বিশ্বভাষা ভাণ্ডারের প্রধান প্রধান শব্দকোষের পার্শ্বে এই অতি প্রাচীন সভ্য জাতি বাঙ্গালীর সাগর-বিশাল মাতৃভাষার অভিধানের স্থান ও মর্যাদা দান এবং উদ্দেশ্য রূপায়ণে তিনি প্রধানত অনুসরণ করেছেন ডক্টর স্যামুয়েল জনসনের অভিধান ও অক্সফোর্ড ডিকশনারি। এর প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর অভিধান সঙ্কলন পদ্ধতিতে এবং ভূমিকার সশ্রদ্ধ মন্তব্যেও—"আমরা বাঙ্গালা অভিধান প্রণয়নে আদর্শের বহু পশ্চাতে আছি, তথাপি বাঙ্গালা ভাষায় শব্দসম্পদ যে সভ্যজগতের সমৃদ্ধ ভাষাসমূহের তুলনায় স্বকীয় স্থান বজায় রাখিতে সমর্থ তাহা বলাই বাহুল্য। পাশ্চাত্য জগতের বৃহত্তম শব্দকোগুলির মধ্যে ইংরেজীভাষার

অভিধানের শব্দসংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক এবং জগতের সর্বাধিক ভূখণ্ডে তাহার প্রচলন।" [হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৮ : ১৩] এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন "Latest Edition of Webster's *New International Dictionary of the English Language*" এবং "New English Dictionary on Historical Principles" এর নাম। ফলে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস অভিধান সঙ্কলনের মূল আদর্শ করেছেন বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজি অভিধানসমূহকে, অমরকোষ জাতীয় সংস্কৃত অভিধানকে নয়।

পক্ষান্তরে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এর সঙ্কলন পদ্ধতিতে ইংরেজি অভিধানের প্রভাব পড়লেও তাঁর নীতি ও আদর্শের ক্ষেত্রে Monier-Williamsকৃত "A Sanskrit-English Dictionary" অর্থাৎ সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানের গভীর অনুসরণ লক্ষ্যযোগ্য। 'বাকপতি' রবীন্দ্রনাথের পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা *বঙ্গীয় শব্দকোষ* প্রণয়নের মূল কারণ উল্লিখিত হলেও এবং ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের অকুণ্ঠ প্রশংসায় আভিধানিক বিভূষিত হলেও (স্মর্তব্য : আপনি যে বিরাট কর্ম আপনার অদ্ভুত নিষ্ঠা ও সাধনার একচিন্ততার শক্তিতে সমাপ্ত করিলেন, তাহার জন্য মাতৃভাষার অনুরাগী প্রত্যেক বঙ্গাভাষীকে এবং সমগ্র জগতের ভাষাতত্ত্বের আলোচকগণকে আপনার নিকট চিরঋণী করিয়া গেলেন।") তাঁর শব্দকোষে এমন সব শব্দ অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যা একালে নয়, কোনো কালেই বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত হয় নি। আমরা তাঁর আভিধানের অ থেকে সামান্য কয়েকটি শব্দের উল্লেখ করছি। অকল্য (এর অর্থ দেওয়া হয়েছে-অসুস্থ, রোগী, অসমর্থ, সত্য); অক্রব্যাদ; অক্ষপূগ; অক্ষাগ্রকাল; অগ্নিষ্টোম; অগ্নিসাদ; অগ্নীধ্র; অগ্রেদিধিষু; অঙ্কুশদুর্দ্ধর; অঞ্চ; অতিপতি; অত্রিজ; অদভ্র; অধিজ্য; অধ্যাক্রান্ত; অনাপ্ত; অনামৃষ্ট; অনায়ুষ্য; অনার্ত্তব; অনুদ্যূত; অনুস্বান; অনৌরস; অন্তস্তোয়; অন্যাদা; অন্যনাভি; অন্যোদর্য্য; অব্যলীক; অব্যসন; অস্বাম্য ইত্যাদি। এর বেশির ভাগ শব্দই বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে শব্দনির্বাচনে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্যতম নয় গণ্যতম লক্ষ্য ছিল যাতে সংস্কৃত পাঠার্থীরিও বিশেষ উপকার হইবে।"

সংস্কৃতের অধ্যাপক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং অফুরন্ত আস্থার সঙ্গে যেভাবে পাণিনীয় পন্থায় বাংলা শব্দের বিশেষত অর্থতৎসম শব্দের ব্যাখ্যা ও ব্যুৎপত্তি প্রদানের চেষ্টা করেছেন তাতে ক্ষেত্রবিশেষে অত্যধিক সংস্কৃত তথ্যের চাপে মূল বাংলা শব্দটি লক্ষ্য না থেকে উপলক্ষে পরিণত হয়েছে [যেমন *পাগল* বিণ [অর্বাচীন সংস্কৃত, পাকল > ল (?) ঃ হি ৺ল] বঙ্গীয় শব্দকোষ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩০০; এরপর অর্থ দেওয়া হয়েছে ৯ টি। Av. 'Para'—side : end: *পার* ক্লী [√পার + অ (অচ্) ধি: পর + অ (অন্) স্বার্থে (অ. টী): পার– পারভূত উদয়াদ্রি

(ঋগ্বেদ ১.৪৬.১১)] পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৩১৬। মাকড় বি [সং মর্কট > প্রা মক্কড (হে) > বা °ড় ; মাকোর (গো-চ); হি মকড়া,- ড়ী; ঠ মাকড (বানর); মৈ মকরা] পৃষ্ঠা সংখ্যা- ১৭৫৭। মুহূর্ত পুং, ক্লী [হুর্চ্ছ কৌটিল্য + ত (ক্ত)-ক, বাহুলকে 'মু' (মুট) আগম, দীর্ঘ, 'ছ' লোপ, পা ৮.৭৮; ৬.৪.২১] পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৮১১] সর্বশেষে আর একটি শব্দের ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা তুলে ধরছি : লোকপুং [√লোক + অ (যঞ)-র্ম; লোক-অন্তরিক্ষ; ইন্দ্রলোক (ঋগ্বেদ ৩.২.৯; ৩৭-১১] ১ ভুবনসামান্য (অ. টী)। "ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুত : রা ১. ৬. ২। প্রাপ্য পুর্ণ্যকৃতং লোকান গী ৬.৪২। মনু ৪.২১৯। চৌদ্দ লোক কাঁপিয়ে ভা. চ ৪৪। [বিশ্বস্থূলভাবে ভূ, ভুবর, স্বর (পৃথিবী, অন্তরক্ষি, স্বর্গ) এই তিনভাগে বিভক্ত এবং ত্রিভুবন ত্রিলোকী ত্রৈলোক্য ইত্যাদি শব্দ বিশ্ববাচক। বিশেষ বিভাগে লোকসংখ্যা চতুর্দ্দশ ভূলোক ভুবর্লোক স্বর্লোক মহর্লোক জনলোক তপোলোক সত্যলোক— এই সপ্ত উর্দ্ধলোক এবং অতল বিতল সুতল তলাতল মহাতল রসাতল পাতাল— এই সপ্ত অধোলোক। অধোলোকের ক্রমভঙ্গও দেখা যায়। সপ্ত অধোলোক সহিত ভূলোক, ভুবর্লোক এবং মহর্লোকাদি সহিত স্বর্লোক— এইরূপ লোকত্রয়ে অন্তর্ভূত চতুর্দ্দশ লোক ত্রিলোকী। ইহা কল্পিত লোকময় পুরুষের পাদাদি চতুর্দ্দশ অঙ্গে অবস্থিত (ভ ২.৫.৩৮-৪২। বেদান্তসর। ম ৯৪৮)।] পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯৭১। ব্যুৎপত্তি এবং ১নং অর্থ-ব্যাখ্যার পরে ২-এ এসেছে পৃথিবী আর ৩-এ জন, মনুষ্য। সুতরাং সাধারণ শিক্ষিত লোকের পক্ষে বহুলোক পাড়ি দিয়ে মানুষ জন খুঁজে পেতে হয়। তবে বিশাল *বঙ্গীয় শব্দকোষ* থেকে এ ধরনের দুচারটে শব্দের উদাহরণ দিয়ে মন্তব্য করা সমীচীন হবে না যে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত অনুরক্তি বা আনুগত্য বাংলাভাষার ওপর পাণিনি ব্যাকরণের অন্যায় আধিপত্য বিস্তারের প্রবণতাজাত। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ অসংখ্যা দেশজ আঞ্চলিক এবং বাংলা ভাষায় প্রচলিত বিদেশী (আরবি, ফার্সি, ইংরেজি) শব্দের নির্বাচনে। যথা অনাবিল, কদ্দিন, কনেষ্টবল, কবরেজ, কবলা, কবুল, কজ্জা, কমবক্ত, কয়াল, ইল্লত, ইশকাবল-পোন, উচ্ছে, উজাগর, উজাড়, উথল-পাথল, উদাস, এলাকা, এলেম, কালি, কিতাব, চমচম, চব্বি, জলুস, জহরত, জাদরেল, জুলুম, টালমাটাল, ঢকমা, তক্তা, দুম্বা, ধাঙড়, নাচন, নাজির, পয়দা, পয়মাল, পারগণা, না; পাদান, বকাবকি, বদল, বরাবর, ভেদা, মহল, মহরম, রাস্তা, লস্কর, লাওয়ারেশ, শাদী, শায়েস্তা, সোডা, সোয়ামি, হকচকা, হকার, হাকিম, হজম, হজরত, হলপ-ক, হাজিরা, হারাম, হালাল ইত্যাদি। বাংলা ভাষায় প্রচলিত এ ধরনের শব্দনির্বাচনে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসে যেমন কোনো কুণ্ঠা ছিল না, তেমনি হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোনো দ্বিধা ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায় না। এ দু'জন আভিধানিকই আন্তরিক প্রেম ও ঔদার্যে বাংলাভাষাকে ঋদ্ধ করার সংকল্পে জীবনব্যাপী সাধনায় স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তাঁরা তাঁদের জীবনকালে প্রচলিত

ভাষাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন গভীর নিষ্ঠায় সঙ্গে এবং সহৃদয় সমীক্ষণে তার সম্ভাব্য ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সাহিত্য থেকে প্রচুর প্রয়োগ দৃষ্টান্ত উদ্ধার করেছেন অতুলনীয় পরিশ্রমে। তারা এ সত্য গভীরভাবে জানতেন আভিধানিক কোনো ভাষার নিয়ামক বা বিধায়ক নন; তাঁদের ভূমিকা মূলত সঙ্কলকের এবং নমুনা সংগ্রাহকের। একাধিকবার *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* ও *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এর শরণাপন্ন হয়ে আমাদের মনে হয়েছে, রাজশেখর বসুর *চলন্তিকা* এবং *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* যতো আধুনিক হোক না কেন, আভিধানিকের দৃষ্টিভঙ্গিগত প্রশ্নে তাঁরা কেউ-ই জ্ঞানেন্দ্রমোহন কিংবা হরিচরণের থেকে খুব একটা ঔদার্য দেখতে পারেননি। বাংলাভাষায় প্রবলভাবে প্রচল এমন অনেক শব্দকে যেখানে রাজশেখর বসু ও শৈলেন্দ্র বিশ্বাস 'অশুপ্রঃ' বা অশু (অর্থাৎ অশুদ্ধ প্রয়োগ) বলে রায় দিয়েছেন কিংবা তাঁদের অভিধানে সঙ্কলনযোগ্য মনে করেন নি (যেহেতু ব্যাকরণ সমর্থিত নয়) তার দুচারটে শব্দ যখন জ্ঞানেন্দ্রমোহন কিংবা সংস্কৃতপন্থী হরিচরণে পাই (*বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ অশুদ্ধ বলে কোথাও রায় দেওয়া হয়নি, বলা হয়েছে অসাধু) তখন বিস্মিত না হয়ে উপায় থাকে না। যেমন :

ইতিপূর্বে, ইতিমধ্যে, দুটো শব্দকেই *চলন্তিকা* (একাদশ সংস্করণ ১৩৮০) বর্ণনা করেছে অশুপ্র এবং শুদ্ধরূপ দেখানো হয়েছে ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৩) *সংসদ অভিধান* (চতুর্থ সংস্করণ) অবশ্য অশুদ্ধ বলে ছেড়ে দেয় নি, বলেছে "ইতঃপূর্বে-এর অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ" "ইতোমধ্যে-এর অশুদ্ধ কিন্তু চলিত রূপ (পৃষ্ঠা সংখ্যা ৮৮)। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ইতঃপূর্বে, ইতোমধ্যে যেমন সঙ্কলন করেছেন, তেমিন সমান গুরুত্বের সঙ্গে স্থান দিয়েছেন ইতিপূর্বে ও ইতিমধ্যে-কেও (প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৭৫)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ ইতিপূবে নেই, তবে ইতিমধ্যে- উদাহরণসহ উপস্থিত; ইতিমধ্যে ক্রি, বিং ১ ইহার মধ্যে; এই সময়ে। ইতিমধ্যে কি দুঃখ উঠিল তব মনে কৃ ২৯৩। ইতিমধ্যে ... যাউক নিজ দেশ ম ৩২৭। ইতিমধ্যে চোর দিবে ধরি বি সু ৮১। ইতিমধ্যে পুলিসের একজন সারজন ... তাহার হাত ধরিল আ. দু ২৪। (পৃষ্ঠা সংখ্যা - ৩৪৪) অস্তমান *চলন্তিকা* এবং *সংসদ অভিধান* পরিষ্কার ঘোষণা করেছে শব্দটি অশুদ্ধ এর শুদ্ধ রূপ হচ্ছে, অস্তায়মান (*চলন্তিকা* পৃ. ৫১), সেখানে *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ আছে "অস্তমান বিং [উদীয়মান'-এর অণুসরণে "°ন" পদ্যে] অস্তগমনোন্মুখ। "শেষযৌবনের ভরে, দেহ ঢল ঢল করে অস্তমান ভানুর তুলনা।-হেম ১৬। "সিন্ধুগর্ভে অস্তমান অংশুমালী মত" (প্রথম খণ্ড, পৃ. ২১১)। অস্তমান শব্দটিকে কেন 'অশুদ্ধ' বলা হলো তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য, কারণ সংস্কৃত-ব্যাকরণ বিধি -অনুসারে 'অস্তমান' গঠিত হয় নি, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যায়ও তা বোঝা যায়। তবে তিনি বলেছেন শব্দটি পদ্যে ব্যবহত হয় (উদাহরণও দিয়েছেন কাব্য থেকে) কিন্তু আমরা জানি গদ্যেও

'অন্তমান' অনুপস্থিত নয়। যেমন : কখনো অন্তমান চন্দ্রের মতো অনিমেষভাবে চাহিয়া থাকে," [রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : গল্পগুচ্ছ, শোভা]।

উদ্যোগ— *চলন্তিকায়* শব্দটির অন্তর্ভুক্তি নেই, 'উদ্‌যোগ'-আছে। *সংসদ অভিধানে* 'উদ্যোগ' আছে 'উদ্‌যোগ' নেই (উদ্‌যাপন , উদ্‌যুক্ত থাকলেও)। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান*-এ "উদ্যোগ (-দ্দো-, জ্জো) [পা.-উয্যোগ> বাং প্রাকৃ. উজ্জোগ; গ্রা০-উজ্জুগ। উৎ-যুজ্ (যোগ করা) + যঞ (ভা.) জ=গ] বি. উদ্যম; চেষ্টা যত্ন। ২ আয়োজন যোগাড়। ৩ উৎসাহ" (১ম খণ্ড, ৩২৩)। অর্থাৎ জ্ঞানেন্দ্রমোহন 'উদ্যোগ' শব্দের এ বানানটি কেবল গ্রহণ করেন নি, এর সঙ্গে উচ্চারণ নির্দেশের ক্ষেত্রে প্রথমে দিয়েছেন 'উদ্‌দোগ' এবং পরে 'উজ্‌জোগ্'। তবে এখানে লেখা অনুসারেই উচ্চারিত হওয়া বাঞ্ছনীয়; উদ্যোগ-উদ্‌দোগ এবং উদ্‌যোগ-উদ্‌জোগ। 'উদ্যোগ' এবং 'উদযোগ' নিয়ে বিতর্ক আসলে অর্থহীন, কারণ উদযোগে 'উদ্' উপসর্গটিকে পৃথকভাবে লেখা হয়েছে আর 'উদ্যোগে'-মিলিয়ে। বর্ণবিচারেও এদের মধ্যে পার্থক্য নেই। তবে সংস্কৃত যেহেতু য-ফলার জন্যে বাংলার মতো কোনো প্রতীক চিহ্ন (্য) নেই, তাই যে বর্ণে য-ফলা যুক্ত হয় তার সঙ্গে মিলিয়ে একটি 'য' লেখা হয় এবং উচ্চারিত হয় অনেকটা 'উদিয়োগ্'-এর মতো।

উপরোক্ত— বাংলাদেশের বিভিন্নপত্র-পত্রিকায় এবং সংবাদপত্রের চিঠিপত্র বিভাগে শব্দটি নিয়ে বেশ নরম-গরম আলোচনা হয়েছে এবং এর শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা বিষয়ে কেউ কেউ চরম সিদ্ধান্তও ঘোষণা করেছেন। আমরা পর্যবেক্ষণ করবো শতাব্দ-ব্যাপী বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত শব্দ সম্পর্কে কোন অভিধানে কী বলা হয়েছে :

(১) সুবলচন্দ্র মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান*-এ "উপরোক্ত—উপর্য্যুক্ত শব্দের পরিবর্তে অসাধু প্রয়োগ।" (পৃ. ২৭৭)।

(২) *বাঙ্গালা ভাষার অভিধানে*-এ শব্দটির অন্তর্ভুক্তির পর লেখা হলো "উপর্য্যুক্ত দ্র.।" আর সেখানে বর্ণনা করা হয়েছে "উপর্য্যুক্ত [উপরি+উক্ত] বাং অশুদ্ধ রূপ। উপরোক্ত' " (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৩৬)। (৩) *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ "উপরোক্ত বিং [উপর+উক্ত; 'উপর্য্যুক্ত' সাধু হি উপরোক্ত, উপর্য্যুক্ত] উপরি কথিত; পূর্ব্বোক্ত; পূর্ব্ব লিখিত।" (১ম খণ্ড, পৃ. ৪৩১)।

(৪) *চলন্তিকায়* রাজশেখর বসু কেবল 'উপর্যুক্ত' রেখেছেন এবং হয়তো উপরোক্ত বর্জন করেছেন সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম মান্য করে।

(৫) *সংসদ অভিধান*-এ " উপরোক্ত—উপর্যুক্ত-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ।" (পৃ. ১০৬)।

(৬) কাজী আবদুল ওদুদের *ব্যবহারিক শব্দকোষ* বহুল সংশোধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ)-এ "উপরোক্ত-ণ, (অশুদ্ধ কিন্তু চলিত) উপর্যুক্ত" (পৃ. ১০৯)

(৭) বাংলা একাডেমী প্রকাশিত (১৯৮৮) *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*-এ "উপরোক্ত (অ.প্র.), উপর্যুক্ত-১ বিণ. পূর্বে উক্ত হয়েছে এমন, পূর্বে কথিত।' (১ম সংস্করণ, পৃ. ১৪৭)।

অর্থাৎ কোনো আভিধানকিই শব্দটিকে শুদ্ধ বলেন নি, সুবলচন্দ্র মিত্র বলেছেন 'অসাধুপ্রয়োগ'; জ্ঞানেন্দ্রমোহন -'অশুদ্ধরূপ', হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়- "উপর্যুক্ত-সাধু' কিন্তু ' উপরোক্ত' 'অসাধু উল্লেখ করেন নি; শৈলেন্দ্র বিশ্বাস, কাজী আবদুল ওদুদ এবং মুহম্মদ এনামুল হক (যেহেতু তিনি স্বরবর্ণ অংশের সম্পাদক ছিলেন *বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধানের*) শব্দটিকে অশুদ্ধ বলেও 'চলিত রূপ' স্বীকার করেছেন।

উপর+উক্ত= উপরোক্ত বাংলা মতে সন্ধি করলেই শব্দটি পাওয়া যায়। কিন্তু পণ্ডিতদের বিচারে এ-সন্ধি 'না-জায়েজ' কারণ 'উপর' খাঁটি বাংলা শব্দ, কোনোমতেই সংস্কৃত নয়; সুতরাং বিশুদ্ধ সংস্কৃত 'উক্ত' (বচ্+ক্ত) -এর সঙ্গে সন্ধি অবিধেয়। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা-সন্ধিতে কী নিয়ম চালু হবে বা হওয়া উচিত সে-বিষয়টি তো এখনও নিরীক্ষা-পর্যায়ে, সংস্কৃত-সন্ধির সূত্র তো তার নিয়ামক হতে পারেনা। কারণ "সংস্কৃত সন্ধির নিয়ম বাঙ্গলার পক্ষে খাটে না- বাঙ্গালা সন্ধির অন্য নিয়ম আছে" [সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ১ : ১] ফলে শতাধিক বছর ধরে প্রচলিত বাংলা শব্দটিকে রাজশেখর বসু ব্যাকরণ-দুষ্ট বলে গ্রহণ না করলেও 'সংস্কৃত -পন্থী' আভিধানিকেরা বিশেষত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় শব্দকোষ* এ অন্তর্ভুক্তি প্রদানে কার্পণ্য দেখান নি।

একত্রিত— *চলন্তিকায়* একত্র' আছে, কিন্তু একত্রিত নেই। *সংসদ অভিধানে* এ 'একত্রিত' আছে; তবে 'অশুদ্ধ-হিসেবে চিহ্নিত। জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে 'একত্রিত' শব্দ সঙ্কলন করে বলা হয় "এই শব্দ রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় প্রথম ব্যবহার করেন, পরে বাং-য় ক্রমে প্রচলিত হয়।" (১ম খণ্ড, পৃ. ৩৬৯)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় শব্দকোষ* এ 'একত্র'-কে 'সাধু' আখ্যায়িত করেও 'একত্রিত' শব্দটিকে একাধিক প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত সহযোগে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, রাজশেখর বসু যেখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ-সম্মত নয় বলে বাংলা ভাষায় প্রচলিত 'একত্রিত' শব্দ গ্রহণ করলেন না, হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় সেখানে বাংলা সাহিত্য থেকে প্রয়োগ-উদাহরণ দিয়ে জীবন্ত ভাষার বহমান ধারাকেই স্বাগত জানালেন।

পার্বত্য— *চলন্তিকা* আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান-এ রাজশেখর বসু স্থান দিয়েছেন 'পার্বত' 'পার্বতীয়' শব্দের; কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাবে না পার্বত্য শব্দটি, তবে

শব্দটি না থাকলেও বাংলাভাষায় *চলন্তিকা* থাকবে এবং বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামও বিলুপ্ত হবে না কখনও। *সংসদ অভিধান*— এ শব্দটি আছে; হয়তো *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অণুসরণে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়— পার্বত্য শব্দের বর্ণনা করেছেন— পার্বত্য বিণ [সং তীয়] পর্ব্বতজাত। "°ত্য টাঈন ক.চ ২২৩।" (*বঙ্গীয় শব্দকোষ*, ২খণ্ড, পৃ. ১৩৯১)।

ভাসমান— রাজশেখর বসু 'ভাসমান-কে বর্জন করেন নি তবে বর্ণনা করেছেন "ভাসমান-দীপ্তিমান, শোভামান। যাহা ভাসিতেছে। (বাংলায় ভ্রান্তপ্রয়োগ)" (পৃ. ৫৫৮)।

সংসদ অভিধান-এ "ভাসমান-বিণ শোভামান, দীপ্তিমান, (বাং) ভাসিতেছে এমন (বায়ুস্তরে ভাসমান বাষ্পপুঞ্জ। [সং. √ ভাস্ + মান (শানচ্) -তু-ভাসা]" (পৃ. ৫৪৪)।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে-"ভাস [ভাস্ (দীপ্তি পাওয়া)+অ] বি. শোভা কান্তি।২. দ্যুতি; দীপ্তি; আভা।-মান-বিন. দীপ্তিমান। ২ শোভাযুক্ত। ৩ যা জলে ভাসিতেছে। ৪ আভাস।" (২ খণ্ড, পৃ. ১৬৮৩)। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ বর্ণনা করেছেন— "ভাসমান বিণ [ভাস+মান (শানচ্)-ক] দীপ্যমান, প্রকাশমান। ২ (বাঙলায়) জলের উপর প্রকাশমান; প্লবমান। "ভাসমান প্রেমার্ণবে।-রঙ্গ-৭। ন ১৩২৭,-৮। এই সংসার সমুদ্রে আমি ভাসমান তৃণ ব. পৃ. ৬২।" (২খণ্ড, পৃ. ১৬৭৮)। চারটি অভিধানেই 'ভাসমান'-এর প্রথম অর্থ দেওয়া হয়েছে দীপ্তিমান, পরে ভাসিতেছে এমন" বা 'প্লাবমান'। কেবল রাজশেখর বসু সংস্কৃত ব্যাকরণ-বিধি অনুসারে আমাদের জানিয়েছেন "বাংলায় ভ্রান্তপ্রয়োগ" কারণ 'ভাস্ ধাতু যেহেতু পরস্মৈপদী তাই 'শানচ্ -প্রত্যয় যুক্ত করা অবৈধ। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন জাগে বাংলায় প্রচল যে শব্দটির অর্থান্তর-সহ মেনে নিতে জ্ঞানেন্দ্রমোহন হরিচরণের আপত্তি দেখি না সেখানে 'আধুনিক বঙ্গ ভাষার অভিধান'-এ 'ভ্রান্তপ্রয়োগ' জানানোর কী অর্থ হতে পারে ?

আমরা এ-ধরনের আর একটি বিতর্কিত শব্দের উদাহরণ দেবো। শব্দটি হচ্ছে :

মুহ্যমান— *চলন্তিকার* ৫৯৯ পৃষ্ঠায় শব্দটি পাওয়া গেল: মুহ্যমান-অশুদ্ধপ্রয়োগ (মোহ্যমান দেখ)। ৬০৬ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে" মোহ্যমান-(মুহ্যমান অশুপ্র.) মোহপ্রাপ্ত, অভিভূত, কাতর ('শোকে-')। অর্থাৎ রাজশেখর বসুর মতে 'মুহ্যমান' অশুদ্ধ আর 'মোহ্যমান' শুদ্ধ। এবং *সংসদ্ অভিধানে* শৈলেন্দ্র বিশ্বাস *চলন্তিকার* পথ অনুসরণ করে জানালেন "মুহ্যমান-বিণ. মোহগ্রস্ত, আচ্ছন্ন, বিহ্বল, আত্মহারা, অতিশয়কাতর (শোকে মুহ্যমান)। [সং মোহ্যমান-এর অশু. কিন্তু চলিত রূপ]" (পৃ. ৫৮৫)।

বাঙ্গালা ভাষার অভিধান-এ "মুহ্যমান-[মুহ্ (চিত্ত বিকৃত হওয়া)+ আন (য, ম আগম)] বিণ. মোহপ্রাপ্ত। ২ মুষড়ান; শোকবিহ্বল।" (২ খণ্ড, পৃ. ১৭৮৪)।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ শব্দটি বর্ণনা করেছেন "মুহ্যমান বিণ ['মুহ্যন' সাধূ] ১ মোহপ্রাপ্ত। "মুণ্ডকোপনিষং ৩-১-২। ঋগ্বেদ ১. ৬৪. ২., সাণ। মুহ্যমান প্রাণ কু. কে ৪০। ২ [বাঙলায় অপ্র]মোহপ্রাপ্ত মূর্হিত। "(রাম) সীতা বলি হৈল মুহ্যমান ম. পা ১০২।" (২ খণ্ড পৃ. ১৮১১)।

ঋগ্বেদে 'মুহ্যমান' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, 'মুণ্ডকোপ নিষদে "সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয় শোচিত মুহ্যমানঃ (৩।১।২)। ফলে সংস্কৃত ব্যাকরণমতে শব্দটি অসিদ্ধ হলেও আর্ষপ্রয়োগ রূপে পণ্ডিত মহল শব্দটিকে মেনে নিয়েছেন এবং বাংলাভাষী শিক্ষিত মানুষও শব্দটি ব্যবহার করছেন। মোহপ্রাপ্ত, বিহ্বল, আচ্ছন্ন, কাতর ইত্যাদি অর্থে। ব্যাপক প্রচলন-হেতু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর *শব্দকোষে* 'মুহ্যন'-কে 'সাধু' বলেও 'মুহ্যমান'কে প্রয়োগ দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা করেছেন, কোথাও 'মোহ্যমান'-এর উল্লেখও করেন নি। তাহলে রাজশেখর বসু এবং তাঁর অনুসারী পণ্ডিতবৃন্দ কোন ব্যাকরণ বিধিতে 'মোহ্যমান' কে শুদ্ধ বলে রায় দিলেন তা আমাদের কাছে দুর্বোধ্য। কারণ আমরা জানি 'মুহ্'-ধাতু পরস্মৈপদী, তার সঙ্গে 'শানচ্' প্রত্যয় যোগ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ, এর বৈধ প্রত্যয় হচ্ছে 'শতৃ' - যা যোগ করলে ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দ হবে'মুহ্যন' (হরিচরণ যাকে 'সাধু' বলেছেন), কোনোক্রমেই 'মোহ্যমান' নয়। ফলে আমরা এ-প্রসঙ্গে বিনয়ের সঙ্গে বলতে পারি, জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস কিংবা হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংস্কৃত ভাষাজ্ঞান তাঁদেরকে রক্ষণশীল পণ্ডিতে বা ভাষাবিধায়কে পরিণত করে নি, জীবন্ত বাংলা ভাষায় আগত সংস্কৃতমূলক শব্দের ব্যুৎপত্তি-ব্যাখ্যায় অধিকার নেই এবং কোনো অভিধানেই সব কিছু যেমন পাওয়া যায় না, তেমনি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্তও হয়না কোনো শব্দকোষ। এ-কথা স্মরণ রেখেই আমরা সংক্ষিপ্তভাবে তুলে ধরতে চেষ্টা করবো *বাঙ্গালা ভাষায় অভিধান* ও *বঙ্গীয় শব্দকোষ* -এর কতিপয় বৈশিষ্ট্য :

(১) বাংলা ভাষায় বড় আকারের তিনটি অভিধানই একক প্রচেষ্টায় সঙ্কলিত,— সুবলচন্দ্র মিত্রের *সরল বাঙ্গালা অভিধান* ; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* এবং হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। এ-ত্রয়ী-অভিধানের মধ্যে *বাঙ্গলা ভাষার অভিধান* বৃহত্তম এবং তারপরেই *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। তুলনামূলকভাবে জ্ঞানেন্দ্রমোহান দাসের অভিধানে দেশজ-আঞ্চলিক (তাঁর ভাষায় 'প্রাদেশিক') শব্দের সংখ্যা যেমন অধিক তেমনি *বঙ্গীয় শব্দকোষ*-এ আধিক্য ঘটেছে সংস্কৃতমূলক শব্দের। লক্ষাধিক শব্দের নির্বাচনে নানা ধরনের অসঙ্গতি, অযৌক্তিকতা এবং অসম্পূর্ণতা খুঁজে পাওয়া কঠিন নয় (যেমন, জ্ঞানেন্দ্রমোহনের অভিধানে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক শব্দের অন্তর্ভুক্তি বহুক্ষেত্রে কোনো ভাষিক নীতিমালা বা মানদণ্ডে নির্ধারিত

হয় নি; হরিচরণের শব্দকোষে সংস্কৃত সাহিত্যেও বিরল ব্যবহৃত দীর্ঘ সমাসবদ্ধ সন্ধি-প্রত্যয়জাত দুর্বোধ্য তৎসম শব্দের অন্তর্ভুক্তি ইত্যাদি)। তবু যতোদিন বাংলাভাষী মানুষ থাকবে ততোদিন এ-প্রামাণ্য অভিধান দুটোর প্রয়োজন শেষ হবে না ঐতিহাসিক কারণেই।

(২) বানানের ক্ষেত্রে জ্ঞানেন্দ্রমোহন এবং হরিচরণ দু'জনই পুরোনো রীতির অনুসারী, বিকল্প বানান প্রদানে উদার এবং বিদেশী শব্দের বানানে সর্বত্র সুনির্দিষ্ট নীতিমালার অনুসরণ লক্ষ্যযোগ্য নয়। যদিও জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানের পরিশিষ্টাংশে (ন) বিদেশী নামের বাঙ্গালা প্রতিবর্ণীকরণ (Transliteration)" ও "(ত) বাংলা বানানের নিয়ম (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত)" সংযুক্ত করা হয়েছে (২য় সংস্করণ, ১৯৩৭)।

(৩) শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ধারণ এবং অর্থ নির্দেশে *বাঙ্গালা ভাষার অভিধান* ও *বঙ্গীয় শব্দকোষ* বেশির ভাগ ক্ষেত্রে অভিন্ন রীতির অনুসারী। তবে শব্দার্থ-প্রকাশে দু'জন আভিধানিক বহু প্রতিশব্দ প্রদান করে প্রয়োগ-দৃষ্টান্ত (সর্বত্র কালানুক্রমিক নয়) দেখালেও সংস্কৃতমূলক শব্দের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় অধিকমাত্রায় সংস্কৃতি-তথ্যাশ্রয়ী বলে মনে হয়। তাঁদের নির্বাচিত সব শব্দের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, অর্থ-নির্দেশ, ব্যুৎপত্তি-অনুসন্ধান সর্বত্র যে সংশয়হীন তা বলা আমাদের উদ্দেশ্য নয়, তবে হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এ-সব ক্ষেত্রে যে প্রশ্নাতীত সততার প্রমাণ দিয়েছেন, তা অবিস্মরণীয়। কোনো বিষয়ে যখন তিনি বুদ্ধিগ্রাহ্য যৌক্তিক মীমাংসায় পৌঁছাতে পারেন নি, তখন আনুমানিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা না করে, প্রশ্নবোধক চিহ্নে (?) বিজ্ঞাপিত করেছেন তাঁর অকপট জিজ্ঞাসাকে (কচলা, কচাল, পৃ. ৫১৪; কটাশীয়া, -শো, পৃ. ৫১৭; দাদরা , পৃ. ১০৯৫; পানতুয়া, পৃ. ১৩১৩ ইত্যাদি।)

(৪) জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধানে শব্দের উচ্চারণ নির্দেশ করা হয়েছে (যদিও পদ্ধতিটি অল্প-বিস্তর জটিল, অসম্পূর্ণ এবং সর্বত্র সঙ্গতিপূর্ণ নয়, আমরা এ-বিষয়ে সময়ান্তরে বিস্তারিত আলোচনা করবো)। কিন্তু হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অভিধানে উচ্চারণ না দেওয়ার যে কারণ নিবেদন করেছেন : " . বাঙলা অভিধান বাঙালীরই জন্য, দেশগত কিছু উচ্চারণ ভেদ থাকিলেও, বাঙ্গালীর বাঙলা শব্দের উচ্চারণ বুঝিতে এত কষ্ট হইবে না।" (পৃ. ২২) এটা কোনোমতেই যুক্তিগ্রাহ্য নয়। কারণ পৃথিবীর যে কোনো ভাষার বিখ্যাত অভিধান তো প্রধানত সেই ভাষী মানুষের জন্যেই সঙ্কলিত হয়, তাই বলে আভিধানিকবৃন্দ কখনও শব্দকোষের অপরিহার্য বিষয় উচ্চারণ-নির্দেশ বর্জন করেন না।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস ও হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিধান সঙ্কলনের পর কেটে গেছে কয়েকটি দশক। বাংলা ভাষাভাণ্ডারে যুক্ত হয়েছে অসংখ্য নতুন শব্দ, নানা

বিষয়ের নানা জাতের; বানানের অর্থের এবং শব্দ-প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘটেছে ব্যাপক পরিবতন (এর আংশিক পরিচয় পাওয়া যায় *চলন্তিকা*, *ব্যবহারিক শব্দকোষ*, *সংসদ বাঙ্গালা অভিধান* এবং বাংলা একাডেমী প্রকাশিত অভিধানসমূহে)। কিন্তু নিরন্তর অগ্রসরমান বাংলা ভাষার এ-বহমান ধারাকে ধারণ করার মতো সঙ্কলিত হচ্ছেনা কোনো বিশাল বিশ্বাসযোগ্য আধুনিক ভাষাবিজ্ঞান সম্মত আদর্শ অভিধান। তাই দেশে এতো ভাষাবিজ্ঞানী থাকা সত্ত্বেও বাঙালী জাতিও বাংলা ভাষার দিকে তাকিয়ে আমাদের বারংবার মনে পড়ে সেই জ্ঞানেন্দ্রমোহন ও হরিচরণকেই , যাঁরা তাদের কালে দেশ-জাতি ও ভাষার জন্যে ঐতিহাসিক কর্ম-সম্পাদন করে, আজ ইতিহাসে পরিণত।

টীকা

১। রাধাকান্ত দেব প্রধানত 'অমরকোষ', 'অভিধান চিন্তামণি' ইত্যাদি বিখ্যাত সংস্কৃত অভিধান অবলম্বনে সঙ্কলন করেন 'শব্দকল্পদ্রুম' অভিধান। সাত খণ্ডে বিভক্ত এ-গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ১৮২২ সালে, সপ্তম খণ্ড ১৮৫২ এবং পরিশিষ্ট খণ্ড ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

২। যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য— *বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়*, উল্লেখ্য, ১৭৪৩ থেকে ১৮৬৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত অভিধানের অধিকাংশ তথ্য এ-গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত।

৩। পঞ্চানন মণ্ডলের *পুঁথি পরিচয়*, ৪র্থ খণ্ডে (৩৮৮ পৃষ্ঠায়) বাংলা অভিধানের একটি *পাণ্ডুলিপির* (বিশ্বভারতী পুঁথি-১৭৬২) খবর জানা যায়, ৯৮ পৃষ্ঠার খণ্ডিত পাণ্ডুলিপিটি রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের *বঙ্গভাষাভিধান* (১৮১৭)-এর আগেকার।

গ্রন্থপঞ্জি

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৭৮ — *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। নতুন দিল্লী : সাহিত্য অকাডেমি।

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ১৯৭০ — *বাঙলা অভিধান গ্রন্থের পরিচয়*। কলকাতা : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — *সরল ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গলা ব্যাকরণ*। কলকাতা।